অনুশীলনী ২

১। যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২। সংবিধানের ৩৫৬নং ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২৪.৫ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের হয় না; তারজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যবস্থার। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হ'ল দলীয় ব্যবস্থা।

২৪.৫.১ দলীয় রাজনীতি ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

একটি দেশের দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি মূলগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অংশগুলির সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষে আমরা প্রভাবশালী এক-দলীয় ব্যবস্থা কার্যকরী দেখতে পাই। সামান্য কিছু সময় ছাড়া বেশি সময়ই কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে এক-দলীয় শাসন দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে দেখা যায় প্রাধান্য সৃষ্টিকারী দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপরই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নির্ভর করে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস দল একটানা কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে সরকার চালিয়েছে। তবে এর মধ্যে কেরালায় ২৯ মাসের জন্য অ-কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল। ১৯৪৭-৬৭, ১৯৭১-৭৭, ১৯৮০-৮৩ সময়ের মধ্যে আমরা কংগ্রেস দলের প্রাধান্য দেখতে পাই। ১৯৬৭, ১৯৭১ এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল ব্যতীত অন্য সময়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। পন্ডিত নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় রাজ্যস্তরের নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যুর পর রাজ্যস্তরের নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। কংগ্রেসী মুখ্য-মন্ত্রীরা পন্ডিত নেহরু (১৯৬৪) এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর (১৯৬৬) উত্তরসূরী নির্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়তা করেন।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর থেকে ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত থাকে এবং কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের বিকাশ। পঞ্চাশের দশকে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি আঞ্চলিকতাবাদকে প্রকট করে। রাজ্য পুনর্গঠনের পরেও সীমানা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ষাটের দশকে দেখা যায় হিন্দি সম্প্রসারণ বিরোধী আন্দোলন এবং আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রকাশ। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল – তামিলনাড়ুর ডি এম কে, এ আই এ ডি.এম কে, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগুদেশম, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, অসমে অসম গণপরিষদ, বিহারে ঝাড়খন্ড পার্টি, উত্তর-পূর্বে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল, অল পার্টি হিল লীডারস কাউন্সিল, গুর্খা ন্যাশনাল লিগ, কেরলে কেরল কংগ্রেস এবং পাঞ্জাবে অকালি দল। এদের মধ্যে কয়েকটি দল নিজেদের রাজ্যে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এই আঞ্চলিক দলগুলি জনমত গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়। এটি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, যদি কেন্দ্রে ও কতকগুলি রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে তাহলে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। একটি রাজনৈতিক দল যেমন করে পারে অন্যদের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এটি একটি বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে। আমরা এই অসুবিধা আরও বিশদভাবে আলোচনা করব।

২৪.৫.২ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মতবিরোধের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক বিষয় বা ঘটনা ঘটে যা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধিতার সম্ভাবনাকে প্রকট করে। এই বিরোধ শুধুমাত্র আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য নয়, এই বিরোধ সীমিত সম্পদের বন্টনকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে। মতবিরোধের কিছু উৎস :

১। ক্ষমতা ও দায়িত্ব সমানুপাতিক নয় : আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন বিষয়ের বন্টনের সময়ে কেন্দ্রীয় তালিকায় অধিক বিষয় রয়েছে। শুধু এটাই একমাত্র কারণ নয়, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে আরও অনেক বিষয় আছে। তুলনামূলকভাবে রাজ্যের রাজস্বের উৎসগুলি নির্দিষ্ট ও কর আদায়ের সামান্য ব্যবস্থা আছে। রাজ্য যে রাজস্ব সংগ্রহ করে তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। কিন্তু দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য রাজ্যের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, যেমন, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। রাজ্যগুলির নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য আরও বেশিমাত্রায় রাজস্বের প্রয়োজন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক সম্পদ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণ করতে পারে। এই সবকিছুই রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন গঠন করতে পারেন। এই কমিশন কেন্দ্র-ও রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের কিছু যেমন, আয়কর, আবগারি কর ইত্যাদি বন্টন করে। এছাড়া অনুদানের জন্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন খরা, বন্যা প্রভৃতির সময় রাজ্যগুলি কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে।

২। পরিকল্পনার পদ্ধতি : ১৯৫০-৫১ সাল থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারতবর্ষ পরিকল্পনার পথ অনুসরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের মূল কাজ হ'ল দেশের সামগ্রিক সম্পদের বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি অর্থনৈতিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা পরিকল্পনা কমিশনের অংশ হিসেবে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য হন। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামতেরই অধিক গুরুত্ব থাকে। এই কারণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

৩। **রাজ্যপাল :** বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালের অবস্থান থেকে দলীয় রাজনীতির অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। রাজ্যের রাজ্যপালগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কার্যত তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা যে দল কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে সেই দলেরই সমর্থক হন। তাই স্বাভাবিকভাবে রাজ্যপালের কাজকর্ম রাজ্যসরকারের পছন্দসই নাও হ'তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন – তাঁরা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য কোনও বিল পাঠাতে পারেন অথবা ৩৫৬ নং ধারা জারি করতে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করতে পারেন যা আমরা ২৪.৪.৪ বিভাগে দেখেছি।

২৪.৫.৩ সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র

যদিও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ অধিক গুরুত্ব পায় তবুও ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সব ক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্পর্ক নয়। অনেক সময় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি একে অপরকে সহযোগিতা করে। প্রথমদিকে নেহরুর নেতৃত্বে যখন কংগ্রেস দল অধিকাংশ রাজ্যে সরকার গঠন করেছিল তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সহযোগিতার দায়িত্ব নিয়েছিল। অনেক কংগ্রেসী-মুখ্যমন্ত্রী তার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের প্রয়াস চলত। এই পদ্ধতি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ এমনই একটি সংস্থা যে-বিষয়ে পূর্ববর্তী বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে। মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা, যেমন সাম্প্রদায়িক সমস্যা, খরা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলন বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন মন্ত্রী, সচিব, কমিশনার ইত্যাদি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

কিছু সংস্থা আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে, কিন্তু সেই সংস্থাগুলি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করতে সাহায্য করে। যেমন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলি কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতিগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

২৪.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রবণতা

পাঁচ দশক ধরে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকরী রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা কিছু প্রবণতা দেখতে পাই। এর মধ্যে অন্যতম হ'ল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। রাজ্য সরকারগুলি আরও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দাবি করে। তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকার বিচারপতি রাজামান্নার নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেছিল। এই কমিশন রাজ্যগুলিকে আরও ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট সরকার একই দাবি পেশ করে। পাঞ্জাবের অকালি দল আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবে রাজ্যগুলির জন্য আরও ক্ষমতা দাবি করে। এই দাবিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার বিচারপতি সারকারিয়ার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কেন্দ্র-রাজ্যের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এই কমিশন আন্তঃরাজ্য পর্ষদ গঠন করার সুপারিশ করে। কিন্তু এই কমিশন অনেক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেনি।

ভারতের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিভিন্নতার কথা মনে রেখে আঞ্চলিক দাবিগুলি কিছু পরিমাণে মেনে নেওয়া যায়। এই কারণে আঞ্চলিক পর্ষদ, যেমন পশ্চিমবঙ্গে গোর্খা পার্বত্য পর্ষদ গঠন করা হয়েছে অথবা পঞ্চায়েতকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ভারতবর্ষে সব জায়গায় সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি বা বিকাশ হয়নি। কিছু

রাজ্য, যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত। এই কারণে রাজ্যগুলিতে আরও সম্পদ বন্টনের প্রয়োজন আছে। আপনি একটি বিষয় লক্ষ করে থাকবেন, যে সব রাজ্য অন্যদের তুলনায় বেশি উন্নত তারাই রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দাবি করে।

অনুশীলনী ৩

১। একই দলের আধিপত্য কীভাবে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে?

.....

.....

.....

.....

.....

২। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের পদমর্যাদা কী?

.....

.....

.....

.....

.....

২৪.৭ সারাংশ

যুক্তরাষ্ট্র হ'ল একধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে দু-ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয় – একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে রাজ্য সরকার। সংবিধান দু-ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেয় এবং বিচার বিভাগ মধ্যস্থতা করে।

দীর্ঘদিনের বিবর্তনের পথ চেয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তার রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইংরেজ রাজত্বে শুরু হয়ে এই প্রক্রিয়া ১৯৩৫ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছায়। স্বাধীনতার পর সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বীকার করলেও রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও পুনর্গঠন চলতে থাকে।

সংবিধান দু-ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠা করে : কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। বিভিন্ন বিষয়গুলিকে সংবিধান দু-ধরনের সরকারের মধ্যে তিনটি তালিকার মাধ্যমে ভাগ করে দিয়েছে – কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোনও বিরোধের সৃষ্টি হলে তা সমাধান করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের। সংবিধানে অনেক কেন্দ্রিকরণের বৈশিষ্ট্য আছে, যার মধ্যে একটি হ'ল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

ভারতে প্রাধান্যকারী এক-দলীয় ব্যবস্থা এবং প্রাধান্যকারী দলের প্রকৃতি যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রাজ্যগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক দলের উদ্ভব এবং তাদের জাতিগত ভিত্তি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধিতার সৃষ্টি করে। এই বিরোধিতা তীব্রতর হয় দুর্লভ

সম্পদের জন্য দাবি ও রাজ্যপালের পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে আবার আমরা অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা দেখতে পাই। সাধারণ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সমন্বয়কারী নীতি নির্ধারণ করে এবং রাজ্যগুলিও পারস্পরিক সহযোগিতা করে।

অধিক ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক দাবি আমাদের চোখে পড়ে। সারকারিয়া কমিশন বিভিন্ন সুপারিশ করেছে এই দাবি মেটানোর। কিন্তু যে দেশে অ-সম অর্থনৈতিক বিকাশ ও বিভিন্নতা রয়েছে সে দেশে কেন্দ্র-রাজ্য মতপার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আঞ্চলিক পর্ষদ অথবা পঞ্চায়েতকে আরও শক্তিশালী করা হ'লে এই পার্থক্য কিছু পরিমাণে কমানো যাবে।

২৪.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলি থাকবে :

১। ● বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা
- ● অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
- ● দেশীয় রাজ্যগুলির সংহতি সাধন
- ● সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

২। ● কেন্দ্রীয় তালিকা – ৯৭টি বিষয়
- ● রাজ্য তালিকা – ৬৬টি বিষয়
- ● যুগ্ম তালিকা – ৪৭টি বিষয়

যুগ্ম তালিকার বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রণীত আইনের মধ্যে বিরোধ বাধলে কেন্দ্রের আইনই বলবৎ থাকবে।

অনুশীলনী ২

আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলি থাকবে :

১। ● যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য রাজ্যসমূহের অবিচ্ছেদ্য সমাহার।
- ● রাষ্ট্রসমবায়ে রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।
- ● যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে।
- ● রাষ্ট্রসমবায়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির ওপর নির্ভরশীল থাকে।

২। ● মন্ত্রিপরিষদকে অপসারণ করা যায়।
- ● রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া যায়।
- ● রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে সংসদ আইন প্রদান করতে পারে।

অনুশীলনী ৩

আপনার উত্তরে নীচের বিষয়গুলি থাকবে :

১। ● প্রভাবশালী দলের কাঠামোর প্রকৃতি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক প্রভাবিত করে।
- ● কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অস্থিরতা (মতবিরোধ)।

২। ● কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে।
- ● রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কোনও বিল পাঠাতে পারে।
- ● ৩৫৬ নং ধারা জারি করার পরামর্শ দিতে পারে।

একক ২৫ ❑ ক্ষমতার হস্তান্তর

গঠন

২৫.০ উদ্দেশ্য

২৫.১ প্রস্তাবনা

২৫.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা

২৫.২.১ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

২৫.২.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ

২৫.৩ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

২৫.৩.১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীর মতামত

২৫.৩.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণের মতামত

২৫.৪ ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

২৫.৪.১ বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি

২৫.৪.২ অশোক মেহতা কমিটি

২৫.৫ বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা

২৫.৬ পঞ্চায়েতীরাজের মূল্যায়ন

২৫.৭ সারাংশ

২৫.৮ অনুশীলনী

২৫.০ উদ্দেশ্য

এই বিভাগে ক্ষমতার হস্তান্তর ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অংশে ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা, তার গুরুত্ব ও দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিভাগটি পড়ার পর আপনি :

- ক্ষমতা হস্তান্তর কাকে বলে বোঝাতে পারবেন
- ভারতে বর্তমান গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন ও
- ভারতের পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার বর্ণনা ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২৫.১ প্রস্তাবনা

হস্তান্তর বলতে বোঝায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উর্ধ্বতন সরকারের ক্ষমতা অর্পণ, উর্ধ্বতন সরকার থেকে অন্যান্য সংগঠনে ক্ষমতা হস্তান্তর।

এই বিভাগে ক্ষমতার হস্তান্তর ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল তৃণমূল পর্যায় অর্থাৎ গ্রামগুলি। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের নীতি ছিল গ্রামীণ সম্পদকে নিঃসরণ করা। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করে, একই সালে রয়াল কমিশন বিকেন্দ্রীকরণের রিপোর্ট জমা দেয়, কিন্তু

তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৯২২ সালে কংগ্রেস ভারত সরকারের কাছে স্থানীয় সংস্থাগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি করার দাবি জানায়। গোপালকৃষ্ণ গোখেল, অ্যানি বেসান্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্যরা গ্রামকে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার একক হিসেবে গণ্য করার কথা বলেন। গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠন হিসেবে অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করে। ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ স্বাধীনতার পরেও সমান গুরুত্ব লাভ করে।

২৫.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি বুঝতে হ'লে আমাদের 'গণতান্ত্রিক' ও 'বিকেন্দ্রীকরণ' এই দু'টি শব্দের অর্থ জানতে হবে। 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি ধারণাটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে এবং সেই সঙ্গে এর প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূল দাবিকেও তুলে ধরে। 'বিকেন্দ্রীকরণ' শব্দটি 'গণতান্ত্রিকে'র লক্ষ্যে পৌঁছনোর পদ্ধতিকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতার ওপর জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বর্তমান থাকে এবং সরকারের ক্ষমতার উৎস হ'ল জনগণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে বোঝায়। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীকরণ বলতে ক্ষমতার আঞ্চলিক বন্টনকে বোঝায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সামাজিক ঐক্য, গণচেতনা ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের সহায়ক বলে মনে করা হয়।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে ক্ষমতার অর্পন (delegation) মনে করা ঠিক নয়। ক্ষমতা অর্পন (delegation) বলতে বোঝায় : যে কোনও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনও অধস্তন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে কিন্তু অধস্তন কর্তৃপক্ষ সেই ক্ষমতা অধিকার হিসেবে উপভোগ করে না বরং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সন্তোষ অনুযায়ী ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধস্তন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান, কিন্তু সেই ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে উপভোগ করার অধিকার পায়। গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও বিস্তৃত করে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা, যার ফলে জনগণ আরও ব্যাপকভাবে ক্ষমতা উপভোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে।

২৫.২.১ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পার্থক্য আছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সম্পর্ক বা যোগাযোগকে বোঝায়। অন্যদিকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি এসেছে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের কাজের ব্যাপারে তৎপরতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা থেকে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ হ'ল পরিকল্পনা রূপায়ণের অধিকার, যার সাহায্যে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণে জনসাধারণ নিজেদের মঙ্গলার্থে কোনও প্রকল্প আরম্ভ করতে পারে স্বাধীনভাবে। তাই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের থেকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ অনেক বেশি ব্যাপকতর বিষয়।

২৫.২.২ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতারও পার্থক্য আছে, যা হল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সরকার ও রাজনৈতিক দলের মূল সংগঠনগত নীতি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা 'গণতন্ত্রের' সঙ্গে কেন্দ্রীকতার মিশ্রণ

ঘটাতে চায়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার প্রকৃতি হ'ল কেন্দ্রাভিগ, যার ফলে ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে মেশে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃতি হ'ল কেন্দ্রাতিগ, যেখানে উচ্চস্তর থেকে ক্ষমতা নিম্নস্তরে হস্তান্তরিত হয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার চেয়ে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণে গণতান্ত্রিক নীতিগুলির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নিম্নস্তরের প্রতিনিধিমূলক সংগঠনগুলিকে আরও ক্ষমতা প্রদান করে গণতন্ত্রের পরিসর আরও বিস্তৃত করে। এখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়।

২৫.৩ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দু'টি সমার্থক ধারণা নয়। যদিও দু'টি ধারণাই জনগণকে আরও বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে তবুও বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ হ'ল একটি রাজনৈতিক আদর্শ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা হ'ল এর প্রাতিষ্টানিক রূপ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করতে, জনগণকে আরও ক্ষমতা প্রদান করতে ও দায়িত্ব অর্পণ করতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন।

২৫.৩.১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

গান্ধীজির ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ বিকাশ সর্বপ্রথম জন-সমর্থন পেতে শুরু করে। তাঁর গ্রামীণ উন্নতির ইচ্ছা থেকে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি এসেছে। গান্ধীজি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, সর্বস্তরে নেতৃত্ব, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে সরকারের একক হল গ্রাম; গ্রামকে ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা বন্টন করতে হবে এবং প্রতিটি স্তরে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকবে। প্রতিটি স্তর গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণে স্বনির্ভর হবে এবং একই সঙ্গে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হবে। তাঁর মতে, উন্নতি বলতে বোঝায় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জনগণের সামগ্রিক অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার পরিবেশ ছাড়া কোনও মানুষেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। এই পরিবেশ বিপদগ্রস্ত হয় যখন সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে।

২৫.৩.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য

গান্ধীজীর মতো জয়প্রকাশ নারায়ণও মনে করতেন যে, স্থানীয় বিকাশ ও প্রশাসনের জন্য গ্রামগুলিকে আরও শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী করতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে তাঁরা দুজনেই গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতে, পঞ্চায়েতীরাজ সর্বোদয় দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটা সমাজকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে পারে। তাঁর সর্বোদয় দর্শন মহাত্মা গান্ধী ও বিনোবা ভাবের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সর্বোদয় দর্শন 'অংশগ্রহনকারী গণতন্ত্রের' (participating democracy) তত্ত্ব প্রচার করে, যার ভিত্তি হ'ল আত্মনির্ভরশীলতা। জয়প্রকাশ মনে করতেন, সর্বোদয় দর্শনে পঞ্চায়েতীরাজ হ'ল এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি মনে করতেন, এটি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার একক নয়, বরং এই নীতির মাধ্যমে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন করা যাবে এবং সেই সমাজ হবে সাম্যভিত্তিক। তিনি পঞ্চায়েতীরাজকে এক নতুন সমাজব্যবস্থার অগ্রদূত বলে মনে করতেন, যা পুরনো শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটাবে।

২৫.৪ ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা পঞ্চায়েতীরাজ নামে পরিচিত। ১৯৫৯ সালে এটির সূচনা হয়, আমাদের দেশে যা ছিল গণতন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণের এক পরীক্ষা। আশা করা হয়েছিল, এই ব্যবস্থা গ্রামীণ মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উদ্যোগ গ্রহণ ও আর্থিক সম্পদ দিয়ে তাদের মনোজগতে এক বিপ্লব ঘটাবে। এ ছাড়াও পঞ্চায়েতীরাজ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের উন্নতি করতে পারবে বলে মনে করা হয়েছিল। গ্রামীণ জনগণ, যারা এতদিন তাদের অধিকার, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত ছিল, আশা করা গিয়েছিল পঞ্চায়েতীরাজ তাদের সেই অধিকার ও ন্যায়বিচারের স্বাদ এনে দেবে।

জনসমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম যা ১৯৫২ সালে শুরু হয়েছিল, পঞ্চায়েতীরাজ তার সঙ্গে মিলিত হয়। পঞ্চায়েতীরাজের দু'টি মূল উদ্দেশ্য ছিল – (১) জনসমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও বেশি জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের সহায়ক করে তোলা, (২) বিকাশের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গ্রামগুলিকে অর্পণ করা। পঞ্চায়েতীরাজের তিনটি স্তর আছে: গ্রামস্তরে গ্রামপঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাস্তরে জেলা পরিষদ।

২৫.৪.১ বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি

১৯৫৭ সালে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি জনসমাজ-উন্নয়ন কার্যক্রম ও জাতীয় প্রসারণ পরিষেবার জন্য বলবন্ত রায় মেহতার নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল গঠন করে। পর্যবেক্ষক দলের প্রধান কাজ হ'ল জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ স্থানীয় উদ্যোগকে কাজে লাগাতে ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে কতটা সফল তা বিশ্লেষণ করা।

১। কমিটি পঞ্চায়েতীরাজের জন্য ত্রি-স্তর বিশিষ্ট কাঠামোর কথা সুপারিশ করে : গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। ব্লককে পরিকল্পনা ও বিকাশের একক হিসেবে গণ্য করা হয়। জেলাস্তরে জেলা পর্ষদের পরিবর্তে জেলা পরিষদ গঠন করা হবে যার মূল কাজ হবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

২। পর্যবেক্ষক দল সরকারি সংস্থা থেকে নির্বাচিত জনসংস্থাগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপারিশ করে : ক্ষমতা থাকবে গ্রাম থেকে জেলা পর্যন্ত। পর্যবেক্ষক দলের মতে নির্বাচিত সংস্থার তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ।

৩। বিধিবদ্ধ নির্বাচিত সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ ও ক্ষমতা অর্পণ করা।

৪। জেলাকে উপদেষ্টার ভূমিকায় রেখে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল একক ব্লক স্তরে স্থাপন করা উচিত।

৫। এই রিপোর্ট প্রতিটি স্তরের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

১৯৫৯ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রীয় পর্ষদ উপলব্ধি করে যে, বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিভিন্নভাবে গণ-তান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। এই কারণে বিভিন্ন রাজ্য তাদের প্রয়োজনমত বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ করে। এর ফলে নানা ধরনের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, যা দু'টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায় :

১। বি আর মেহতা কমিটি অনুযায়ী রাজস্থানের নমুনা, যাতে আছে একটি শক্তিশালী পঞ্চায়েত সমিতি ও পরামর্শদানকারী জেলা পরিষদ।

২। নায়েক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত মহারাষ্ট্রের নমুনা, যাতে আছে একটি শক্তিশালী জেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে কার্যনির্বাহী পঞ্চায়েত সমিতি।

২৫.৪.২ অশোক মেহতা কমিটি

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম অনুসন্ধান ও তাদের আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয় অশোক মেহতা কমিটি নিযুক্ত করে। ১৯৭৮ সালে এই কমিটি তার প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার সুপারিশগুলি হ'ল নিম্নরূপ :

১। রাজ্যস্তরের নীচে জেলাগুলি থেকে বিকেন্দ্রীকরণের সূত্রপাত হবে।

২। পঞ্চায়েতীরাজ হবে দু'টি স্তরে – (১) জেলা স্তরে হবে জেলা পরিষদ ও (২) মন্ডল পঞ্চায়েত। কিছু সময়ের জন্য ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম স্তরে পঞ্চায়েত কাজ চালাবে। এই কমিটি ব্লক স্তরের সমিতিগুলিকে জেলা পরিষদের বিধিবহির্ভূত প্রশাসনিক কমিটি হিসেবে রূপান্তর করার পক্ষে ছিল এবং মন্ডল পঞ্চায়েত গঠিত ও কার্যকরী হয়ে উঠলে তখন এদের অধিকাংশ কাজ করবে মণ্ডল পঞ্চায়েত।

৩। জেলা পরিষদ ছয় প্রকার সদস্য নিয়ে গঠিত হবে – নির্দিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (যতক্ষণ পঞ্চায়েত সমিতি থাকবে), পৌরসভার মনোনীত সদস্য, জেলা যুক্তরাষ্ট্র সমবায়ের সদস্য, দুজন মহিলা সদস্য, জেলা-পরিষদের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত দুজন সদস্যর মধ্যে একজন গ্রামীণ বিকাশে উৎসাহী ব্যক্তি ও অন্যজন স্থানীয় শিক্ষক। জনসংখ্যার ভিত্তিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন।

৪। ১৫,০০০-২০,০০০ জনসংখ্যার জন্য একটি মন্ডল পঞ্চায়েত থাকবে। ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট মন্ডল পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রামীণ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয় – কৃষক, দুজন মহিলা, তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে সভাপতি নির্বাচন করেন।

৫। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি অংশগ্রহণ করতে পারে। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই স্থানীয় স্তরে এদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে যায়।

৬। পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সরকার এই নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে পারে না। এই নির্বাচন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

৭। জেলাস্তর থেকে পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক দিক, পুঁজি বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা হয়।

৮। রাজ্য সরকার দলীয় কারণে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করতে পারে না। যদি কখনও এমন করার প্রয়োজন হয় তাহলে ছ-মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে।

অশোক মেহতা কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। লক্ষাধিক জনগণ ও সহস্রাধিক দরিদ্র মানুষের উন্নতি সাধনে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সঙ্গে প্রয়োজন সাধারণের ইচ্ছা ও দাবি পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ। এইভাবে অশোক মেহতা কমিটি পঞ্চায়েতীরাজ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছে।

২৫.৫ বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা

জনসমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্যের শর্তগুলি কী হবে সে সম্পর্কে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে দু'টি সমাধান পাওয়া যায় – (ক) জেলা প্রশাসনকে সংস্কার করা ও (খ) বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অধিকাংশ পরিকল্পনা রাজ্যস্তরে গ্রহণ করেছিল রাজ্য সচিবালয়। সেই কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় গ্রামস্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ে পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য জেলাস্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিকেন্দ্রীকরণ করে নি। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, দু'টি রাজ্য – মহারাষ্ট্র ও গুজরাট - অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র; কারণ এই রাজ্য দু'টি জেলাস্তরে পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে ব্যাঙ্কগুলি জেলাস্তরে ঋণ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জনসমাজ উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামস্তরে পরিকল্পনা প্রয়োজন, কিন্তু গত তিন দশকে সরকারি তত্ত্বাবধানে গ্রামস্তরে কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এই সমস্যা পঞ্চায়েতীরাজকে দুর্বল করেছে, কারণ নিম্নস্তর থেকে পরিকল্পনার প্রয়াস পঞ্চায়েতীরাজের ভিত্তিস্বরূপ।

অনুশীলনী ১

(ক) নীচের খালি অংশে উত্তর লিখুন।

(খ) বিভাগের পিছনে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

১। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কী বোঝায়?

২। বলবন্ত রায় মেহতার গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি কী কী তা আলোচনা করুন।

৩। অশোক মেহতা কমিটির মূল সুপারিশগুলি কী কী?

২৫.৬ পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পঞ্চায়েতীরাজের সাবলীল ও সুদক্ষ কার্যসম্পাদনকে প্রভাবিত করে।

১। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল নিয়মাবলী প্রণীত হয় তার দ্বারা পঞ্চায়েতীরাজের ক্ষমতার ওপর অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

২। কোনও সংগঠনের গুণ নির্ভর করে তার নেতাদের ওপর। কোনও কোনও পঞ্চায়েতে একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিরোধী নেতৃত্ব আছে আবার অনেক ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব বিরোধমূলক। কিন্তু অধিকাংশ সংগঠনেই একাধিক নেতৃত্ব থাকে যা কিন্তু বিরোধমূলক নয়। অর্থাৎ, সেখানে একের অধিক নেতা থাকে যারা একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

৩। গ্রামীণ সমাজে সাধারণের কল্যাণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পঞ্চায়েতীরাজ সংগঠন এই সমস্যার সমাধানে সফল হয়েছে।

৪। জনসমাজ উন্নয়ন প্রকল্প ও পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল স্বনির্ভর গ্রামীণ জনসমাজ গঠন করা। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তারা এই বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী নয়।

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটু বেশিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। সরকার বিভিন্ন কমিটির অনুমোদন সত্ত্বেও পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণে অনাগ্রহী।

৬। ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের সাহায্য লাভ থেকে বঞ্চিত।

৭। অনেক সময় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন সময়মত হয় না, অনির্দিষ্ট কালের জন্য তা স্থগিত রাখা হয়।

কিন্তু ভারতের মতো বিশাল উপমহাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের একক হিসেবে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানের কোনও বিকল্প নেই। এই পঞ্চায়েতীরাজ এক নতুন ধরনের বিকল্পকেন্দ্রিক নেতৃত্ব গঠনে সক্ষম হয়েছে এবং জনসাধারণ ও প্রশাসন এর মাধ্যমে একে অন্যের সন্নিকটে এসেছে।

অনুশীলনী ২

(ক) খালি জায়গায় উত্তর লিখুন।

(খ) বিভাগের শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

(১) পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির বর্ণনা ও মূল্যায়ন করুন।

২৫.৭ সারাংশ

গণতন্ত্র বাস্তবে কার্যকরী হয় কেবলমাত্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হ'লে। যখন সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ওপর থেকে সমগ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাকে গণতন্ত্র বলা যায় না। ভারতে স্বাধীনতার আগে থেকেই গ্রামীণ বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। গান্ধীজীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করে। ভারতে গণ-তান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পঞ্চায়েতীরাজ হিসেবে পরিচিত। এই পঞ্চায়েতী রাজের সঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প সংযুক্ত রয়েছে। বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি ও অশোক মেহতা কমিটি জেলাস্তরের গুরুত্বের কথা বলেছে। প্রথম কমিটি ত্রি-স্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার কথা বলেছে, আর দ্বিতীয় কমিটি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থার কথা বলেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ, অনধিক ক্ষমতা ও সম্পদ ইত্যাদি এই ব্যবস্থার সাফল্যের পথে অন্তরায়। এই সমস্যাগুলির সমাধান হ'লে গণতন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। ১৯৫৯ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি রাজ্যে শুধু পঞ্চায়েত আইন প্রণীত হয়নি, দেশের অধিকাংশ এলাকাতে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল।

২৫.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। ২৫.২ বিভাগ দেখুন।

২। ২৫.৫.১ বিভাগ দেখুন।

৩। ২৫.৫.২ বিভাগ দেখুন।

অনুশীলনী ২

২৫.৪ ও ১৫.৬ বিভাগ দেখুন।

একক ২৬ ❑ গণতন্ত্র ও ভারতের অনগ্রসর শ্রেণী

গঠন

২৬.০ উদ্দেশ্য

২৬.১ প্রস্তাবনা

২৬.২ কারা অনগ্রসর শ্রেণী?

২৬.২.১ তফসিলী জাতি

২৬.২.২ তফসিলী উপজাতি

২৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী

২৬.৪ উন্নতি সাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থা

২৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের প্রাধিকারমূলক নীতি

২৬.৪.২ সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি

২৬.৪.৩ সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি

২৬.৫ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

২৬.৬ গণতন্ত্র ও অনগ্রসর শ্রেণী

২৬.৭ দুর্বল শ্রেণী সংক্রান্ত নীতি – একটি মূল্যায়ন

২৬.৮ সারাংশ

২৬.৯ উত্তরমালা

২৬.০ উদ্দেশ্য

ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। এই কারণে ভারতীয় সমাজের মূল ধারার সঙ্গে অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য ওইসব শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে এই উদ্দেশ্যে যে প্রয়াস চালানো হয়েছে এই এককটি আপনাকে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেবে।

এই একক পাঠ করলে আপনি –

- ভারতের অনগ্রসর শ্রেণী ও তাদের সমস্যা অনুধাবন করতে পারবেন।
- অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন এবং
- সরকারী নীতির সাফল্যের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২৬.১ প্রস্তাবনা

সারা পৃথিবীতে অনগ্রসর শ্রেণী যে প্রভেদ ও বঞ্চনা ভোগ করে তার বিরুদ্ধে তারা সংগঠিত লড়াই চালিয়ে যায়।

তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার আইনত অংশ পাওয়ার জন্য আন্দোলন করে। এই কারণগুলি সমাজে সুস্পষ্টভাবে সামাজিক ও সংগঠনগত পরিবর্তন এনে দেয়।

২৬.২ কারা অনগ্রসর শ্রেণী?

রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংবিধানে কিছু সংখ্যক জাতি ও উপজাতিকে তালিকাভুক্ত করেছেন। সেই কারণে তফসিলী জাতি ও উপজাতি কথাটি ব্যবহার করা হয়। অনগ্রসর শ্রেণী বা দুর্বল শ্রেণী হ'ল একটি সাধারণ শব্দ। ভারত সরকার এদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরা হ'ল তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী যারা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কিছু বেশী ছিল। ভারতীয় সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বহুদিন ধরে বঞ্চিত জনসংখ্যাকে বোঝাতে আজকাল তালিকাভুক্ত জাতি ও উপজাতি কথাগুলি ব্যবহার করা হয়।

অনগ্রসর শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আন্দ্রে বেতে বলেছেন, "প্রত্যেকটি জটিল সমাজে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি থাকে যারা শিক্ষাগত বা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং সাধারণত তারাই সমাজে নিম্ন-সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনগ্রসরতার কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য বলতে শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়, জন্মগতভাবে কতকগুলি সামাজিক অংশের মানুষকেও বোঝায়। তাই, উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্তরাও অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর শ্রেণীর সদস্যরা সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়।" উপরি-উক্ত শ্রেণীভুক্ত জাতি ও গোষ্ঠীরা তিনটি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে – শিক্ষা সংক্রান্ত, সরকারি চাকরি সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ পায়, বই কেনার জন্য বৃত্তি পায়, ছাত্রাবাসে এদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে, স্কুল-কলেজ-কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা এদের জন্য শিথিল করা হয়। এরা উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির সুযোগ পায়। সরকারি চাকরির সকল স্তরে এদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। চাকরিতে পদোন্নতির শর্তগুলিকেও এদের ক্ষেত্রে উদার করা হয়। অনুরূপভাবে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে এদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী শুধুমাত্র শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য, তারা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পায় না। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বলতে শুধুমাত্র কয়েকটি জাতিকে বোঝাত। এরপর ভারত সরকার প্রতিটি রাজ্যকে আয়ের ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণীর মর্যাদা নির্দিষ্ট করতে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশটিকে বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে, ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অতএব, ভারতের সংবিধানে সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নেই এবং এগুলিকে কার্যকরী করার নীতি হিসেবে সামাজিক কোনও প্রস্তুতির কথাও বলা নেই। অনগ্রসরদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামান্য কিছু পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধান তিন ধরনের বিশেষ গোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধার কথা বলেছে –

(১) তফসিলী জাতি বা পূর্বতন অস্পৃশ্য জনসমাজ।

(২) তফসিলী উপজাতি এবং

(৩) সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী।

ভারতের সংবিধান এই শ্রেণীগুলির সংজ্ঞা দেয়নি বা এগুলিকে নির্দিষ্ট করার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা

বলেনি।

তফশিলী জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে সংবিধান নামকরণের বিশেষ পদ্ধতি প্রদর্শন করেছে। অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংবিধান শুধু যে সংজ্ঞা দেয়নি তাই নয়, কর্তৃত্ব নির্ধারণের পদ্ধতির কথাও বলেনি।

তফসিলী জাতি ও উপজাতি হ'ল সেইসব জনসমষ্টি যারা আদরণীয় ব্যবহার পায়। বস্তুত, তারা সর্বদাই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

তফসিলী জাতি ও উপজাতি সেইসব জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত যারা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রান্তিক স্তরে অবস্থান করে। অথবা, এইসব গোষ্ঠীগুলি তাদের স্থানিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্বের জন্য কতকগুলি বিষয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং সুযোগ-সুবিধা পায় না। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে প্রথম নির্দেশমানা জারি করবেন এবং সংসদের আইন দ্বারা সে বিষয়ে কিছু সংশোধন ঘটতে পারে। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করবেন এবং তিনি তাঁর রিপোর্ট সংসদে প্রকাশ করবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৯৫০ সালে শুধু সমন্বয়সাধন ও প্রতিবেদনের জন্য, কিন্তু কোনও প্রশাসনিক কার্যাবলীর অবকাশ না রেখে, তফসিলী জাতি ও উপজাতির কমিশনারের দপ্তর গড়ে ওঠে।

সমাজে তপসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত লোকেরা জাতিগত উত্তরাধিকার সূত্রে সর্বনিম্ন পদমর্যাদার অধিকারী; তবে এদের মধ্যেও আবার সামাজিক স্তর-বিভাজন ও পদমর্যাদার বিভাজন আছে। এরা বেশিরভাগই ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুর এবং কায়িক শ্রমেই নিযুক্ত।

২৬.২.১ তফসিলী জাতি

তফসিলী জাতি বলতে সেসব সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যদের বোঝায় যারা হিন্দু বর্ণাশ্রমের সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থিত। তার ফলে এরা নানা ধরনের শোষণের শিকার হয়েছিল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অনগ্রসর শ্রেণী বিকাশের জন্য সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। ১৯০১ সালের পর থেকে হিন্দু আধিপত্য সামাজিক সংস্কারকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

১৯০৮ সালের পর বিভিন্ন লেখক মনে করন যে, অস্পৃশ্যরা সংখ্যায় ৫ কোটি বা তার বেশি – ১৯১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ অথবা সমগ্র জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ হল অস্পৃশ্য। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই নিম্নশ্রেণীদের সরকারিভাবে নিম্নস্তরে অবস্থিত হওয়ার কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১৯৩৬ সালে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার বিধিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তফসিলী জাতিদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী অস্পৃশ্যদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা তফসিলী জাতি সংক্রান্ত একটি আদেশ প্রদান করে যা মূলত ১৯৩৬ এর তালিকার সমতুল্য। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী তফসিলী জাতির জনসংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটিতে।

তফসিলী জাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভিত্তি হল জাত। একটি জাতি একটি রাজ্যে তফসিলীভুক্ত হ'তে পারে আবার অন্য প্রতিবেশী রাজ্যে তা নাও হ'তে পারে।

তফসিলী জাতির জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই দরিদ্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তফসিলী জাতির ৫২ শতাংশ হ'ল ভূমির সঙ্গে জড়িত শ্রমিক, ২৮ শতাংশ হল কৃষক (মূলত ক্ষুদ্র চাষী)। পশ্চিম অঞ্চলে অধিকাংশ তাঁতী তফসিলী

জাতির অন্তর্ভুক্ত আর পূর্বাঞ্চলে সব মৎস্যজীবীরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই জাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু এই জনসমষ্টির অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে।

২৬.২.২ তফসিলী উপজাতি

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীকে চিহ্নিতকররণের তুলনায় তফসিলী উপজাতির চিহ্নিতকরণ অনেক সহজ। উপজাতি চরিত্র সংবলিত দলগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপজাতিরা সাধারণত জঙ্গল, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। এরা বন্যজাতি, বনবাসী, পাহাড়ী, জনজাতি, অনুসূচিত জনজাতি হিসেবে পরিচিত। এইগুলির মধ্যে তফসিলী উপজাতিরা আদিবাসী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সংবিধানে এদের 'অনুসূচিত জনজাতি' বা তফসিলী উপজাতি বলা হয়।

আধুনিককালেও এই উপজাতিরা নিজেদের আচার-ব্যবহার পালন করে এবং নিজেদের গন্ডির মধ্যে বিবাহ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে উপজাতিরা একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করে।

কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য ছাড়া উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে অন্যান্য গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের তেমন কোনও পার্থক্য নেই। এই উপজাতিরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম এবং তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বলে এদের তফসিলী উপজাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৫ সালের আইনে প্রথম অনগ্রসর উপজাতিদের প্রতিনিধিত্বের কথা ভাবা হয়। ১৯৩৬ সালে পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য জায়গার উপজাতিদের একটি তালিকা করা হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ২ কোটি.৫৪ লক্ষ উপজাতিভুক্ত লোক ছিল।

সারা দেশে তফসিলী উপজাতি চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি একই। এই চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতি ১৯৩৫ সালের উপজাতি তালিকার সামান্য পরিবর্তন করেন। উপজাতিরা অধিকাংশ মধ্য, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাস করে। উপজাতিরা তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উপজাতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি ওঠে। কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাবের ফলে সরকারি চাকরি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও লাভ হয় না। তাই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হয়।

অনুশীলনী ১

১। সংবিধানে তফসিলী জাতিকে কীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

২। তফসিলী উপজাতিদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী যারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাদের চিহ্নিতকরণের কোনও সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেই। অনগ্রসর শ্রেণী এই শব্দটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্য পৃথকভাবে অনগ্রসরতাকে ব্যাখ্যা করে।

অনগ্রসর শ্রেণীর প্রথম একটি ব্যবহারিক অর্থ পাওয়া যায় মহীশূরের একটি দেশীয় রাজ্যে। ১৯১৮ সালে মহীশূরের সরকার অনগ্রসর শ্রেণীর সরকারি কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহদানে একটি কমিটি গঠন করে। ১৯২১ সাল থেকে এই সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং তাদের চিহ্নিত করা হয় এইভাবে যে "ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সকলে, যারা পর্যাপ্ত সরকারি কাজে অংশ নিতে পারেনি।"

কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে অনগ্রসর শ্রেণীর কোনও যাথার্থ্য নির্ণয় করা হয়নি। এই শ্রেণীর কোনও সর্বভারতীয় সংগঠন নেই। কিন্তু সংবিধানে কার্যকরী হওয়ার পরবর্তীকালে অনগ্রসর শ্রেণীর সংগঠন গড়ে ওঠে এবং একটি জাতীয় সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬১ সালের মে মাসে ক্যাবিনেট স্থির করে যে জাতের পরিবর্তে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসরতাকে চিহ্নিত করা হবে। মে মাসের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে জাতীয় সংহতি রক্ষার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নির্ধারিত অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তিকে সমর্থন করা হয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনতা মোর্চার জয় জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণীর বিষয়টি আবার নিয়ে আসে।

ভারতে অনগ্রসর শ্রেণী সংসদীয় গণতন্ত্রে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের পথকে সুগম করতে সাহায্য করে।

২৬.৪ উন্নতিকারক পদ্ধতিসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান রাজ্যগুলিকে জনকল্যাণ, বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণের নীতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়। তফসিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এর থেকে লাভবান হয়।

২৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণমূলক নীতি

নানা ধরনের সংরক্ষণ, যেমন – সরকারি চাকরিতে, আইনসভাগুলিতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা বলা হয়। সংরক্ষণ নীতি পরিবেষ্টন করে যে-সব বিষয় তা হ'ল :

১। রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

২। সরকারি চাকরি

৩। শিক্ষা

৪। অর্থনৈতিক উন্নতি

তাই সম্পূর্ণভাবে আমরা তিনটি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখতে পাই – আইনসভা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে। প্রথমটি সংবিধানে আছে, দ্বিতীয়টি সংসদ তৈরি করেছে এবং তৃতীয়টি তৈরি করেছে প্রশাসনিক সংস্থা। এই সংরক্ষণগুলি প্রথম দিকে ১০ বছরের জন্য কার্যকরী করা হয়েছিল। পরে এর মেয়াদ বাড়ানো হয় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, তারপর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এবং তারপর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়। আরও দশ বছরের জন্য এই সংরক্ষণের মেয়াদ সম্প্রসারিত হয়েছে।

এই সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি রয়েছে। কিন্তু, কিছু কিছু ক্ষেত্র থেকে এই সংরক্ষণের বিরোধিতা করা হয়। যেমন – বিহার ও গুজরাটে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

২৬.৪.২ সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি

সংরক্ষণের পক্ষে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেখানো হয় সেগুলি হ'ল :

১। বহুযুগ ধরে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের শুধু নীচু জাতি বলে ঘৃণা করা হয়নি, তাদের সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। এই অসাম্য দূর করতে সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২। শত শত বছরের বঞ্চনার ফলে সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে তফসিলী জাতি ও উপজাতির যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য এই শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় তারা সমাজের অগ্রগতির মূলধারার সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবে না।

৩। মহাত্মা গান্ধী, বি আর আম্বেদকর প্রমুখের প্রয়াস সত্ত্বেও অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। এক্ষেত্রে, বিহারে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাই তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য উচ্চশ্রেণীদের সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে।

৪। মনে করা হয়, শিক্ষা সমতা আনতে সক্ষম। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য ভর্তি সংক্রান্ত আসন-সংরক্ষণ সমর্থনযোগ্য।

৫। সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।

২৫.৪.৩ সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি

সংরক্ষণের পক্ষে যেমন যুক্তি আছে, এর বিপক্ষেও তেমন কিছু যুক্তি আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হ'ল :

১। সংরক্ষণের ফলে তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তারা এই সুবিধাগুলি অনন্তকাল ভোগ করবে। তাদের এই মানসিকতা শুভ ইঙ্গিত বহন করে না এবং তাদের অলস করে দেয়।

২। সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অনগ্রসর শ্রেণীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা

যেতে পারে, হরিজনরা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য নির্বাচন ও দলীয় ব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে।

৩। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নৈপুণ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ ক্ষতিকারক হ'তে পারে। যোগ্যতাই নিয়োগের মাপকাঠি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। যদি সংরক্ষণ শুধুমাত্র জাতের ভিত্তিতে হয় তাহলে তা জাতপ্রথাকে সমর্থন করে। কিন্তু সংবিধান জাতের ভিত্তিতে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে। অনগ্রসর অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীকে প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত দিক থেকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করার পর চাকরির সময় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া অনুচিত। চাকরির সংরক্ষণের পরিবর্তে সুযোগ-সুবিধার সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

সংরক্ষণের চার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এর সমর্থক ও বিরোধীরা এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। সমর্থকরা মনে করে এই নীতি কোনও পার্থক্য আনতে সমর্থ হয়নি। বুদ্ধিজীবীরা মনে করে সংরক্ষণ নীতি অ-গণ-তান্ত্রিক। সংরক্ষণ নীতির ফলে তফসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অভিজাতগোষ্ঠীর তারা লাভবান হচ্ছে এবং অন্যদিকে অনগ্রসর শ্রেণীর দীন-দরিদ্ররা লাভবান হচ্ছে না।

তফসিলী জাতির মধ্যে উদ্বৃত্ত ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে পার্থক্য দেখা যায়। হিমাচল প্রদেশ, পন্ডিচেরী, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, হরিয়ানা ৫০ শতাংশ বন্টনে সমর্থ হয়েছে। সব থেকে কম বন্টন হয়েছে দাদরা ও নগর হাভেলিতে (০.৮৮ শতাংশ)।

অনুশীলনী ২

১। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অর্থ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। অনগ্রসরতা দূরীকরণে সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২৬.৫ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে

সংরক্ষণ নীতির বিবর্তনের কথা জানতে হলে আমাদের ভারতবর্ষে দুর্বল শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে খ্রীস্টান মিশনারিদের আগমনের পর তারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, বিশেষ করে অস্পৃশ্য ও উপজাতিদের শোষিত জনসাধারণ হিসেবে গণ্য করে। তারা এই শ্রেণীর উন্নতি সাধনে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। মিশনারিদের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সমাজসংস্কারকরা যেমন দয়ানন্দ সরস্বতী শোষিত জনগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজ সরকার ও দেশীয় রাজারা শোষিত শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিদ্যালয়, বৃত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান শুরু করেন। এই পদ্ধতির অনুসরণে ১৯০৯ সালে নিম্নশ্রেণীর সমস্যাকে সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যতা চিহ্নিত করা হয়। ক্রমশ মিশনারিদের উৎসাহে অস্পৃশ্য ও উপজাতিরা ধর্মান্তরিত হ'তে থাকে। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারে কিছু সংখ্যক আসন শোষিত শ্রেণীর জন্য মনোনীত করা হয় এবং অস্পৃশ্যরা প্রথমবারের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশে তাদের বক্তব্য রাখে। মুসলিম লীগ তাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুদের মধ্যে বিভাজনের বিরোধিতা করে।

ইংরেজ আমলে অনুন্নত শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে যোগদানের সুযোগ প্রদান শুরু হয় দক্ষিণ ভারতীয় প্রদেশগুলিতে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পেরিয়র ই ভি রামস্বামী। এই আন্দোলন শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিতদের মধ্যে আত্মসম্মানের আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য অব্রাহ্মণ শ্রেণীও এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অনগ্রসর শ্রেণীর আন্দোলনকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১। ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতের অব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভেদ মেটানোর জন্য আন্দোলন,

২। উচ্চজাতের অব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভেদ মেটানোর জন্য আন্দোলন এবং

৩। অস্পৃশ্য জাত ও 'শুদ্ধ' হিন্দুদের বিভেদ সংক্রান্ত আন্দোলন,

অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ডঃ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল অনুন্নত শ্রেণীকে হিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী ছিল, তাই তাদের জন্য একটি নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করা হয়। তফসিলী জাতিকে বলা হয় হরিজন (ভগবানের সন্তান) এবং উপজাতিদের বলা হয় গিরিজন (পাহাড়ের সন্তান)। কিন্তু গান্ধী ও আম্বেদকর দু'জনকেই কীভাবে অস্পৃশ্যদের সমস্যার সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে কোনও সঠিক ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেন। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের কথা বলে। এই নীতির বিরোধিতা করে গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর মতে, এই নীতি হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। ডঃ আম্বেদকর ও গান্ধী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা পুণা চুক্তি নামে পরিচিত এবং এর ফলে অনুন্নত শ্রেণীর সম্প্রদায়কে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে বেশী সংখ্যক সংরক্ষিত আসন দেওয়া হয়, কিন্তু তা যুগ্ম নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে। স্বাধীনতার পর ডঃ বি আর আম্বেদকর গণপরিষদের সংবিধান রচনাকারী কমিটির সভাপতি হন। তিনি ১০ বছরের জন্য তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণে সফল হন।

শোষিত শ্রেণীর জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের নীতি ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সরকার শুরু করে। কিন্তু সেই সময় অস্পৃশ্য উপজাতিদের মধ্য তেমন যোগ্য ব্যক্তি খুব কম ছিল যারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারত।

২৬.৬ গণতন্ত্র ও অনগ্রসর শ্রেণী

টি. বি বটোমর বলেছেন, 'গণতন্ত্র বলতে বাস্তব অর্থে মানুষের মাঝে সাম্যের কথাই বোঝায়; সম্পদ, সামাজিক পদমর্যাদা, শিক্ষা ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অসাম্য এমন পর্যায়ে যাবে না, যা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য সৃষ্টি করবে যা একটি গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর কাছে স্থায়ীভাবে পদানত করে রাখবে। অসাম্য সাধারণত দু'ধরনের –

এক – স্বাভাবিক অসাম্য (প্রাকৃতিক ও কাঠামোগত) এবং দুই – মানুষের তৈরি সামাজিক অসাম্য। সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবি বলতে বোঝায়, প্রত্যেকে আত্মবিকাশের সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং তাদের মধ্যে যে-সব গুণাবলী আছে তার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে।

সাম্যের ধারণা মেধাতন্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তা এই ধারণাই তুলে ধরে যে, মানুষকে তার মেধার ভিত্তিতে বিচার ও পুরস্কৃত করা হবে। ওপর থেকে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে কিছু সম্পূর্ণ করাই সাফল্য নির্ধারণ করবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষকে তাদের মেধা ও আকাঙ্খা অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে দেওয়া। মেধাতন্ত্বের দিক থেকে দক্ষতা বলতে এটাই বোঝায়।

তত্ত্ব হিসেবে সাম্য কখনই স্থিতিশীল নয়। এটি সদা পরিবর্তনশীল ও নিত্য নতুন অর্থ বহন করে। অনেক অসাম্য যা পূর্বে স্বাভাবিক ছিল আজ আর স্বাভাবিক বলে গণ্য হয় না। সুযোগের অভাব, বৈষম্য এবং কিছু অনুদার ব্যবহারের প্রতিবাদেই সাম্যের ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু আজ ভারতীয় সমাজের অবহেলিত গোষ্ঠীরা যাতে উন্নতির জন্য সমান সুযোগ পায় তার জন্য প্রাধিকারমূলক ব্যবহারের সাংবিধানিক অধিকার-কে সাম্য বলা হয়।

২৬.৭ দুর্বল শ্রেণী সংক্রান্ত নীতি : একটি মূল্যায়ন

স্বাধীনতার পূর্বে যে-সব নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সেইসব নীতির বিষয়ে মুম্বই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে একটি অনগ্রসর শ্রেণীবিভাগ গঠন করা হয়। তামিলনাড়ুর ভূমিকা এর পরে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লেবার কমিশনারের পদ তৈরি অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সররকারের থেকেও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও খ্রীস্টান মিশনারিদের ভূমিকা অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ।

পাঁচ দশক ধরে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকাশের প্রয়াস সত্ত্বেও অনুন্নত শ্রেণীর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন বা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তেমন সাফল্য পাওয়া যায়নি। উপরন্তু এই সুযোগ-সুবিধা সব জায়গায় সমানভাবে বন্টিত হয়নি।

ভারতের সংবিধানের প্রধান রচনাকারী ডঃ বি আর আম্বেদকর ১৯৩১ সালে বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু জনকল্যাণের কার্য সম্পাদন করতে হবে যা ভারতের পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকার শোষিত শ্রেণীর (এখন তফসিলী জাতি) সাহায্যার্থে কিছু নীতি গ্রহণ করবে। একইরকমভাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আবশ্যিক

এবং জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতি (এখন তফসিলী উপজাতি) এবং অনুন্নত এলাকার সমস্যাকে স্থানীয় বা প্রাদেশিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা অনুচিত।

ভারতের সংবিধানে তফসিলী জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত একটি পৃথক অধ্যায় আছে। এর থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, সংবিধান রচয়িতাগণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিষয়টির দায়িত্ব নিতে হয় রাজ্য সরকারগুলিকে। আর কেন্দ্রীয় সরকার শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতির উন্নতির জন্য আর্থিক অনুদান দেয়।

১৯৭৭-৭৮ সালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৫৫ সালের পৌর অধিকারের আইন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের কথা বলে। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল দায়িত্ব হ'ল ওই আইনের ১৫ ক(১) এবং ১৬ খ(১) বিভাগ অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলিকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অধিকার যাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা উপভোগ করে সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া। কিন্তু এর মূল প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়নি। এই আইন অনুযায়ী অপরাধ বিচারের জন্য বিশেষ আদালতের কথা বলা হয় যা শুধুমাত্র ৫টি রাজ্যে নামমাত্র রূপে দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত এই আইনের ১০ক বিভাগ অনুযায়ী অপরাধের করণে যৌথ জরিমানা সংগ্রহ কোন রাজ্য করে নি। বিভিন্ন রাজ্যে অস্পৃশ্যতাপ্রবণ এলাকার চিহ্নিতকরণও হয়নি।

১৯৭৮ সালের ২২ মার্চ লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন যে, তফসিলী জাতি ও উপজাতির স্বার্থরক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, যা প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ হ'তে পারে। এই নির্দেশদানের সময় তিনি সংসদে তফসিলী জাতি ও উপজাতি বিষয়ে সমালোচনার ক্ষেত্রে মুলতুবি প্রস্তাবের নজির তুলে ধরেন। এমনকি, রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে এগুলি আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারত, কারণ পরোক্ষভাবে এদের স্বার্থরক্ষা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল।

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদ সংক্রান্ত মন্ত্রী দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে কেন্দ্রের ওপর অধিক দায়িত্ব আরোপের প্রস্তাব আনেন। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির বিফলতার ওপর আলোকপাত করেন।

তফসিলী জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত কমিশনার তাঁর রিপোর্টে বলেন যে, তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রের। ১৯৭৭-৭৮ সালে তাঁর রিপোর্টে তিনি বলেন যে, হিংসাত্মক ঘটনা যা ঘটে তা রাজ্য সরকারগুলির অধীন আইনশৃঙ্খলার সমস্যা এই অজুহাতে কেন্দ্র তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে তা সাধারণ শান্তি ও আইনভঙ্গের ঘটনা হিসেবে মনে করা ঠিক নয়। তফসিলী জাতি ও উপজাতির উন্নয়নে কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না, কারণ ৪৬নং ধারায় উল্লিখিত 'রাষ্ট্র' অর্থে সমগ্র জাতিকে বোঝায়। তাঁর ১৯৭৯-৮০ সালের রিপোর্টে কমিশনার বলেন যে, অস্থির এলাকা সংক্রান্ত আইনে জাতি, সংঘর্ষ, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্মিলিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাঁর এই আশা যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃত্ব সহকারে তফসিলী জাতি ও উপজাতির বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনা রোধে সমর্থ হবে। কিন্তু তা পূরণ হয়নি।

তফসিলী জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে আশা করা হয় যে, তারা যে অসুবিধার বা বিভেদের সম্মুখীন হয়েছিল তা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে দূর করা সম্ভব। এই নীতির মূল লক্ষ্য হ'ল : তফসিলী জাতিভুক্ত মানুষকে অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে পৃথক করে দেখা হবে না এবং এই বিভেদ দূর করার চেষ্টা করা হবে। তফসিলী উপজাতি সংক্রান্ত নীতি আরও বেশি জটিল। এই নীতি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অবস্থার উন্নতির কথা বলে এবং কিছুমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলে।

যদিও তফসিলী উপজাতিরা তফসিলী জাতির মতো নানাপ্রকার সংরক্ষণ উপভোগ করে কিন্তু তারা এ বিষয়ে অনেক উদাসীন এবং আইনের ওপর এদের প্রভাব অত্যন্ত কম।

অনুন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে আধুনিককালে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়টি হ'ল এক অদ্ভুত প্রবণতা যার ফলে অনুন্নত শ্রেণীর বিকাশের সুযোগ-সুবিধা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের সাহায্যে এই প্রবণতাকে রোধ করা যায়। আরও একটি ক্ষতিকারক বিষয় হ'ল অনুন্নত শ্রেণীর সংগঠনগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি।

অনুশীলনী ৩

১। ভারতীয় সমাজে অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতিবিধানের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি কী কী ?

.....

.....

.....

.....

২৬.৮ সারাংশ

ভারতবর্ষে যে-সব জাতি ও উপজাতিগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি যাদের তফসিলী বা তালিকাভুক্ত করেছেন তাদের বলা হয় তফসিলী জাতি ও উপজাতি। এইসব শ্রেণী আইন বা প্রশাসনিক আদেশ অনুযায়ী কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এদের জন্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে আসন সংরক্ষিত থাকে এবং সরকারি চাকরি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও আসন সংরক্ষিত থাকে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য সংবিধান ও সরকার নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধার নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতিগুলি স্বাধীনতার পর থেকে কার্যকরী হয়েছে। আধুনিককালে এই নীতির বিপক্ষে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয় কারণ নীতিগুলি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে সুযোগ-সুবিধা দান করে। সেইজন্য এই নীতিগুলির আরও কার্যকরী প্রয়োগ দরকার।

২৬.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। উপবিভাগ ২৬.২.১ দেখুন।

২। উপবিভাগ ২৬.২.২ দেখুন।

অনুশীলনী ২

১। বিভাগ ২৬.৩ দেখুন।

২। বিভাগ ২৬.৪ দেখুন।

অনুশীলনী ৩

১। বিভাগ ২৬.৭ দেখুন।

পর্যায় ৭ ঃ ভূমিকা — সামাজিক রূপান্তর

এই পর্যায়ে সামাজিক-সংস্কৃতি পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানব সমাজ ও বিশেষার্থে ভারতীয় সমাজ তথা সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি-প্রকরণ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন পদ্ধতিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তনের পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণ উন্নয়ন পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলে বলে যুক্তি দেখান হয়। ভারতীয় সমাজে নারীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতে সমাজ পরিবর্তনের একটি বিশেষ দিক দেখতে পাওয়া যায়। সবশেষে শিক্ষাকে সমাজ-পরিবর্তনের একটি বিশেষ উপাদান বলে মনে করা হয়।

একক ২৭-এ মানব সমাজের সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি-প্রকরণের আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নতুন প্রতিষ্ঠান ও নগরায়ণের ভূমিকাকে সমাজ পরিবর্তনের উপাদান বলেই জোর দেওয়া হয়েছে।

একক ২৮-এ উন্নয়ন পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণের যোগসূত্র আলোচনা করা হয়েছে ও অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ২৯-এ সমাজে নারীদের অংশগ্রহণের কথা ও নারীদের শিক্ষা, কাজ, সামাজিক মর্যাদা এবং নারী-আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ৩০-এ শিক্ষাকে ভারতে সমাজ পরিবর্তনের একটি উপাদান হিসেবে পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও শিক্ষার বিস্তারের ফলে যে পরিবর্তন হয় সে সমস্ত এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ২৭ ❑ সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি

গঠন

২৭.০ উদ্দেশ্য

২৭.১ প্রস্তাবনা

২৭.২ মানব সমাজের রূপান্তর

- ২৭.২.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরসমূহ
- ২৭.২.২ ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা
- ২৭.২.৩ ঐতিহ্যবাহী সমাজে সমাজ - সংস্কৃতির রূপান্তর
- ২৭.২.৪ নতুন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- ২৭.২.৫ গ্রামীন ভারতে সামাজিক রূপান্তর

২৭.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া

- ২৭.৩.১ সমাজ - সংস্কৃতি রূপান্তরের জন্য সংস্কার প্রচেষ্টা
- ২৭.৩.২ গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি
- ২৭.৩.৩ ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন ও সামাজিক সচলতা (mobility)

২৭.৪ নাগরিকতা ও নগরায়ণ

- ২৭.৪.১ নাগরিকতা প্রভাব
- ২৭.৪.২ ভারতে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য
- ২৭.৪.৩ নগরের জনসমাজ ও সামাজিক রূপান্তর

২৭.৫ সারাংশ

২৭.৬ উত্তরমালা

২৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককের বিষয় পড়া হ'লে ঃ

- মানব সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি বোঝা যাবে।
- সমাজের রূপান্তরের পক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করা যাবে।
- ভারতে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের কিছু প্রক্রিয়ার নিরীক্ষা ও
- ভারতে সমাজসংস্কৃতির রূপান্তরে নগরায়ণকে উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা যাবে।

২৭.১ প্রস্তাবনা

সামাজিক রূপান্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তার একটি বিশেষ দিক। সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের বিশেষ দিকগুলিকে এই এককে ব্যাখ্যাকরা হয়েছে। এককের এই কাজে ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতায় পরিবর্তন, সমাজ পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা এবং গ্রামীন ভারতে সমাজ পরিবর্তনের রূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৭.২ মানব সমাজের রূপান্তর

মানব সমাজ তার আবির্ভাবের মুহূর্ত্ত থেকেই সামজিক রূপান্তরের পথে চলেছে। তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও তাদের সীমারেখার বাইরে যেসব শক্তি সক্রিয় সেগুলি এই রূপান্তরের মূল কারণ। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছুসংখ্যক মানব সমাজের অনুধ্যান এই ধারাটি স্পস্ট করে তোলে। যথা — আদিম সমাজ থেকে প্রাক্ শিল্প-সমাজ (ঐতিহ্যবাহী) এবং শিল্প-সমাজ (আধুনিক) প্রভৃতি সমাজগুলির বিবর্তন সমাজ-রূপান্তরের মূল কার্যকরী উপাদানগুলি তুলে ধরে। উপাদানগুলির বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিয়তই সমাজ-কাঠামোয় কাজ করে যেমন, জন্ম ও মৃত্যুর হার, জনসংখ্যা, প্রযুক্তি স্তর এবং অর্থনৈতিক সংগঠনে তার প্রভাব। সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত উপাদানগুলিই সমাজ-কাঠামোকে বিশেষভাবে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করে।

২৭.২.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরসমূহ

বিভিন্ন সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা করে দেখতে হবে। 'সামাজিক' ও 'সাংস্কৃতিক' বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার উপায় হ'ল সামাজিক বলতে কতকগুলি সম্পর্ক, ভূমিকা ও দায়িত্ববোধের সমন্বয় আর সংস্কৃতি বলতে এই সব ভূমিকা ও সম্বন্ধাবলীর প্রতীকী বা নান্দনিক ধরণ বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিবাহ হ'ল একটি সার্বজনীন সামজিক সম্পর্ক; কিন্তু যে সমস্ত প্রথার মধ্য দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তা গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে বা এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে আলাদা হয়। এই সমস্ত পার্থক্য ও ধরণ আলাদা মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও নান্দনিক বোধ থেকে আসে; আর একেই বলা হয় 'সংস্কৃতি'। আমরা দেখি, প্রায় সব সমাজেই পুরোহিত, যাদুকর এবং ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা আছে আর এদের সাথে সমাজের সদস্যদের নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক দেখা দেয়, কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কের ধরণ বা প্রতীকী প্রকাশ প্রত্যেক ধর্ম বা ধর্মীয় সমাজে এক নয়। প্রতীকী প্রকাশের এই পরিবর্তনশীল রূপকেই সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি ও সামাজিক সংগঠনের মধ্যে এই পার্থক্য করা হয় সাধারণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। বাস্তব জীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে খুব সহজে পৃথক করা যায় না। সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক ও ভূমিকা এই সময়ে সংস্কৃতির মধ্যেই অবস্থান করে।

সামাজিক - নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ 'বাস্তব' ও 'অ-বাস্তব' সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখেন। বাস্তব বলতে তাঁরা প্রযুক্তি, শিল্প-রীতি, স্থাপত্য এবং দৈনন্দিন জীবন, গৃহস্থালী, ব্যবসা ও বাণিজ্য, যুদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক কার্যকলাপে ব্যবহৃত বাস্তব দ্রব্যাদি ও হাতিয়ারকে বুঝে থাকেন। সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার প্রকৃতি, বিশ্বাস, পুরাণ, উপকথা ও অন্যান্য কথকতার ধারা প্রভৃতিকেই 'অ-বাস্তব' সংস্কৃতি বলে ধরা হয়। এভাবেই সংস্কৃতির পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় আর এভাবেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের সমাজের শ্রেণীবিভাজন ও তুলনা করতে পারি। এভাবেই কোন একজন ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য ও স্তর বুঝে উঠতে পারে।

২৭.২.২ ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা

'ঐতিহ্য' ও 'আধুনিকতা' শব্দ দু'টি মূল্যবোধের প্রকাশ যা আদিমযুগ থেকে প্রাক্-শিল্পসভ্যতা এবং শিল্পসভ্যতা থেকে শিল্পসভ্যতার পরবর্তী কালে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের পদ্ধতি বুঝতে সাহায্য করে। 'আধুনিকীকরণ' একটি ধারণা যা সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। প্রত্যেক সমাজেরই একটি ঐতিহ্য আছে, কিন্তু যখন আমরা ঐতিহ্যবাহী সমাজের কথা বলি তখন আমরা সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ের কথা স্মরণ করি। ঐতিহ্যবাহী সমাজে সামাজিক স্তর-বিন্যাস স্পষ্ট; পশু-শক্তির প্রভূত ব্যবহারে উন্নত প্রযুক্তির ভিত্তিতে গ্রাম, শহর ও নগরের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় ও এদের সাথে বাচনিক-সাংস্কৃতিক ধারাতেও বিকশিত হয় লিখিত সাহিত্যিক ঐতিহ্য। রাজনীতি, প্রতিরক্ষা ও ধর্মীয় দপ্তরে বিশেষ ধরণের বুদ্ধিজীবীর সাহায্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থ ও ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা সহযোগে এই সব সমাজে এক সংগঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দেখা যায়। মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জীবনধারা, নান্দনিক ও প্রতীকী বিধি ও আদল সমাজে এক ঐতিহ্য গড়ে তোলে যার সাথে অতীতের ধারাবাহিকতা দেখা যায়। ধারাবাহিকতার এই উপাদান একটি সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা মূল্যবোধকেই ঐতিহ্য বলে চিহ্নিত করে। অন্যথায় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গড়ন ও পদ্ধতিকে মূলতঃ ঐতিহ্যবাহী বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়।

২৭.২.৩ ঐতিহ্যবাহী সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর

ঐতিহ্য থেকে আধুনিক পর্যায়ের সমাজের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের কতকগুলি বিশেষ দিক দেখা যায়। এখন মনোযোগ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক।

২৭২.৪ নতুন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সমাজ যতই ঐতিহ্যবাহী অবস্থা থেকে আধুনিকতার দিকে বিকশিত হ'তে থাকে সামাজিক সচলতা ততই বদ্ধ অবস্থা থেকে ক্রমশ মুক্ত অবস্থার দিকে যায়। সমাজে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ও সামাজিক উপাদানগুলি বিকশিত হয়ে সমাজব্যবস্থাকে ক্রমশঃ মুক্ত অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। এই ব্যবস্থাগুলি সাংস্কৃতিক ও সমাজ কাঠামো উভয়েরই অন্তর্গত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে—জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটায়। ভারতের মত, এই সমস্ত পরিবর্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থারও মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। বর্ণাশ্রম, সামন্তপ্রথা ও পারলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধে আচ্ছন্ন ঐতিহ্যবাহী ভারতে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রভূত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মূল্যবোধে লালিত গণতান্ত্রিক ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বর্ণব্যবস্থার অসাম্যের পুরোন মূল্যবোধের প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কী করে এই পদ্ধতির বিকাশ ও তার বীজ ভারতীয় সমাজে প্রোথিত হতে থাকে ? পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মুখোমুখি ভারতীয় সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা এই পরিবর্তনের মূলে। ঔপনিবেশিক শাসন, নয়া প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এদেশে চালু করে। শিক্ষা, আইন ও বিচার, শিল্প-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পরিবহণ ও যোগাযোগ প্রভৃতি নতুন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত হয়। এগুলিই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের নতুন দিক নির্দেশ করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করতে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে মূল্যবোধ প্রচলিত হয়, এগুলি তারই সংস্পর্শে আসে আর এরই ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দেয়।

ভারতে যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রচলিত হয়েছে তার উৎস পশ্চিমের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও শিল্প বিপ্লব। ইউরোপীয় সমাজে রাষ্ট্র ও ধর্ম বা গীর্জার ভূমিকার পৃথকীকরণ পদ্ধতি থেকেই এর জন্ম। এর ফলে, সাধারণভাবে ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন ও বিচার, উৎপাদন ও শিল্প প্রভৃতি জনজীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। বিজ্ঞান ধর্মের মত স্বর্গীয় প্রতীতি বা নির্দেশে সৃষ্টি হয় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রমাণ ও মূল্যায়নের নিয়মের উপরই এর ভিত্তি। তাই ধর্মীয় নীতি যেখানে নিয়ত সত্য বিজ্ঞান সেখানে মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। এর ফলে, মানুষের অদৃষ্ট সম্পর্কে এক মানবিক বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। নিম্নতর প্রজাতি থেকে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের তত্ত্বেই জগতে মানুষের প্রকৃতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতীয়মান হয়। 'ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ' ও 'পতনে'র জায়গায় বিবর্তন, প্রকৃতির নিয়ম ও বিজ্ঞানের সাহায্য অনুসন্ধান প্রচলিত হয়। এই জগৎ ও তার বাইরে নিজের ভাগ্যনির্ধারণে মানুষ এখন নিজেই সক্ষম। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে মানুষ প্রকৃতি, প্রতিবেশী মানুষ ও অপরিচিতের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টিতে সক্ষম। পশ্চিমের এই বিকাশের ধারা সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদের প্রচলন করে। সমাজজীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, ধর্ম বা গীর্জার আওতার বাইরে শিল্প-সংগঠন, রাজনৈতিক দল, কর্মী-সংগঠন এবং জনগণের নির্বাচিত পরিষদ (Assembly) ও সরকারের মত ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিজ্ঞান এই নতুন বিশ্ব-বীক্ষা গড়ে তোলে এবং প্রযুক্তি হয় এর হাতিয়ার।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে এই পরিবর্তন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এর ফলে, প্রথমেই সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের আর্বিভাব দেখা যায়। মানুষের মর্যাদা, তার স্বাধীনতা, সাম্য ও সার্বজনীনতা স্বীকৃত হয়। ফরাসী বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবসমাজের ঐক্যের কথা বলা হয়। ব্রিটেনেও শিল্প বিপ্লব সামন্ততন্ত্র ও তার বিশেষ সুযোগ সুবিধে উঠিয়ে দিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করে। সাম্য, স্বাধীনতা, সমস্ত নাগরিকের পৌর অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গী, সামন্ততন্ত্রের প্রভু ও রাজাদের স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে জোরদার করে। রাজনীতিতে উদারনীতিবাদের আর্বিভাবের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠে; প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় (অবশ্যই অতীতের ধর্মীয় আশ্রম থেকে আলাদা ভাবে) এবং আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে সমাজের নাগরিকদের সমান অধিকার, বাক্ ও সংগঠনের স্বাধীনতা প্রাধান্য পায়। এর ফলে অতীতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই সংবাদপত্র ও মুদ্রিত বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয় ও সংযোগসাধনের অন্যান্য মাধ্যমও বিকশিত হয়। আধুনিকতার উপাদান হিসেবে উদারনীতিবাদ বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধে সমৃদ্ধ মানবিকতাবাদের সারাৎসারকে প্রতিফলিত করে।

২৭.২.৫ গ্রামীণ ভারতে সামাজিক রূপান্তর

উদাহরণস্বরূপ, ভারতের গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। অতীতে মড়ক ও মহামারিতে গ্রামে প্রচুরসংখক লোক ও গবাদি পশু মারা যেত। বসন্ত, কলেরা, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ মানুষের মনে এক দুর্বোধ্য ভয়ের সঞ্চার করত। এই ভীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আর এর ফলে অদৃষ্টবাদ, অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস ও ভ্রমাত্মক রীতি-নীতি দেখা যায়। এর ফলে ভ্রান্ত ধর্মীয় ও যাদুবিদ্যার বিশ্বাস দেখা যায় আর গ্রামে নারী-পুরুষ উভয়েই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষ বিশ্বাস করত যে দুষ্ট প্রেতাত্মা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যেমন গাছের মাথায়, পুকুরে বা বড় জলাশয়ের ধারে ও গ্রামের বহুদূরে সীমানার প্রান্তে বাস করে আর অসময়ে মানুষ তার কাছ দিয়ে গেলেই আক্রান্ত হয়। নতুন চিকিৎসাব্যবস্থার আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরোন মড়ক ও মহামারী নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সেচ-

ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, নতুন বীজ ও চাষের পদ্ধতি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষকে এখন অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত করেছে। এ সমস্তই মানুষের অন্ধ কুসংস্কার ও বিশ্বাস বিশেষভাবে উৎপাটিত করে দিয়েছে। গ্রামে আজকাল ভৌতিক কোন ঘটনা ঘটে না বললেই চলে। রাস্তাঘাট, দোকান, বাস-ষ্টপ ও ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উন্নয়নকেন্দ্র প্রভৃতি নতুন সংগঠনের সাথে গ্রামের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় অতীতের দুষ্ট প্রেতাত্মাদের কল্পিত 'বাসস্থান' এখন অদৃশ্য। আর এর ফলে নতুন প্রজন্ম অতিপ্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সমস্ত স্থানকে স্মরণ করতে পারে না। এই সমস্ত পরিবর্তনই সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণের মাপকাঠি আর এগুলোই সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও অদৃষ্টবাদী মূল্যবোধ কমিয়ে দেয়।

সমাজে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চরম বাধা হয়ে দেখা দেয় আর একটি বিষয়। সে হল অস্পৃশ্যতা, যা অতীত সমাজের স্থবির ও শোষণকারী রূপটি তুলে ধরে। বর্ণাশ্রমের উপাদানগুলি মুক্ত সমাজব্যবস্থা ও উদারনীতিবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র সামাজিক ও দৈহিক সচলতায় বাধা হয়ে দেখা দেয় না; এটি সাম্য ও স্বাধীনতাবোধের মনস্তাত্ত্বিক ধারণাতেও বাধার সৃষ্টি করে। সমাজ সংস্কার ও আধুনিকীকরণের প্রবাহের সাথে সাথেই ভারতে অস্পৃশ্যতার ওপর আক্রমণ শুরু হয়। সুদূর অতীতে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার বিপক্ষে প্রচার করলেও তার কোন স্থায়ী ও সার্বজনীন প্রতিক্রিয়া হয়নি। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও আধুনিকীকরণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাই এই সামাজিক কু-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ও সার্বজনীন প্রচার হিসেবে শুরু হয়। স্বাধীনতার ঠিক পরেই ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে যে দূরীভূত করা হয় তাই নয়, এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌গামিতার পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দপ্তর, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যতার প্রয়োগ স্পষ্টভাবেই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে।

অনুশীলনী ১

১। মানব সমাজ রূপান্তরের পথে চলেছে

ক) বিংশ শতাব্দী থেকে

খ) শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে

গ) মানব সমাজের অস্তিত্বের সময় থেকে

ঘ) পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে

২। অ-বস্তু সংস্কৃতি বলতে কি বোঝান হয় ? এই বিষয়ে তিন লাইন লিখুন।

.....

.....

.....

৩। ভারতের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার একটি বদ্ধ সমাজব্যবস্থা। সঠিক উত্তরে (✓) দাগ দিন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৭.৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া

ইতিহাস অনুসারে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনের সময় থেকে ভারতে আধুনিকতার পথ বিকশিত হতে থাকে। এর মূল চরিত্র এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। আমাদের জাতীয় নেতা — মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করেন। ন্যায়-বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা, যুক্তিবোধ ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মূল্যবোধ উজ্জীবিত করে ভারত সামাজিক রূপান্তরের পথে যাবে বলেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের মতে ভারত উন্নত হবে, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে ও আমাদের জীবন-ধারা ও অতীত ঐতিহ্যের কোন মূল্যবান দিক বর্জন না করে গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজ হিসেবে গড়ে উঠবে। আমাদের জীবনধারার মূল বিষয় সহিষ্ণুতা, অহিংসা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও মানবিকতাবাদ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যা আধুনিক সমাজের সাথে মিলে যায়। আমাদের সংবিধান ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ , গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করে দেশের জনগণকে ধর্ম, জাতি, জন্ম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে উপরি-উক্ত মূল্যবোধগুলির রূপদান করে। তফশিলী জাতি, উপজাতি, মহিলা, সংখ্যালঘু অংশ প্রভৃতিদের মত দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক স্বরূপ এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষভাবে রক্ষিত হয়।

২৭.৩.১ সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্য সংস্কার প্রচেষ্টা

এইসব উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হল ঐক্যমত ও সামঞ্জস্যবিধান। স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনে অহিংসা ও গণতন্ত্রকে আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও সেই একই ধারণা চলতে থাকে আর আইনী সংস্কার, শিক্ষা ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ গণতান্ত্রিক ঐক্যমতকেই আধুনিকীরণ ও উন্নতির উপায় হিসেবে নেওয়া হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সমাজ রূপান্তরের প্রচেষ্টার কার্যকর পরিকল্পনা হিসেবে নেওয়া হয়। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে সংস্কার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, স্বাধীনতার ঠিক পরেই জমিদারী ব্যবস্থা, সামন্তপ্রথা ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের অধিকার উৎখাত করে ভূমিসংস্কার কার্যকরী করা হয়। চাষী ও কৃষকদের জমির নিরাপত্তা দান করা হয়, বড় বড় জমির মালিকদের জমির ওপর সীমা আরোপ করা হয় যাতে বাড়তি জমি ভূমিহীন ও গ্রামীণ সমাজে দুর্বলতর শ্রেণীকে দেওয়া যায়। গ্রামে জনকল্যাণ ও উন্নয়নের স্বার্থে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গ্রামীণ পরিষদ বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। জমিদার ও উচ্চবর্ণ প্রভাবিত বংশ পরম্পরায় গঠিত পরিষদ তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে শহরের জমি ও সম্পত্তির সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। দরিদ্র-কল্যাণে যাতে সহজে টাকা পাওয়া যায় তার জন্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয় ও সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। দুর্বলতর শ্রেণীর প্রতি সামাজিক ন্যায় ও উন্নয়নের গতি তরান্বিত করে যাতে আয়, উৎপাদন ও বৃত্তি সৃষ্টি করে জনকল্যাণ ও সমাজের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয় তার জন্য এইসব পদ্ধতি নেওয়া হয়। অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুশিক্ষিত জনশক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষি, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারই পরিকল্পনা ও সমাজ বিকাশের মূল চাবিকাঠি। কৃষির ক্ষেত্রে যেমন অধিক জমির মালিকানার ওপর সীমারেখা বসিয়ে বন্টনে ন্যায়বিচারের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক চাষ-ব্যবস্থা প্রচলন করা হয় তেমনি শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের জন্য সচেতন প্রচেষ্টায় জনকল্যাণের কাঠামোর মাঝেই ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। শিল্পনীতিতে চেষ্টা করা হয় একচেটিয়া ব্যক্তি মালিকানার উত্থান ও

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার। দু'টি পদ্ধতিই কার্যকর হয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির স্তরে উন্নীত হয়। আধুনিকীকরণের জন্য উচ্চতর শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে বিনিয়োগের ফলে এ সমস্ত সম্ভব হয়েছে।

২৭.৩.২ গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি

গ্রাম থেকে ব্লক স্তরে তারপর জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার ফলে ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সমন্বিত পদ্ধতি জোরদার হয়েছে। ভারতের নির্বাচন পদ্ধতিতে সাফল্য সংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচনা করে। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে এটি কার্যকর পদ্ধতি। বিভিন্ন স্তরে নানা স্বার্থ-গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা সহমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়নের যে পদ্ধতি নেয় তা বিভিন্ন স্তরে গোষ্ঠী ও প্রতিনিধিদের ঘাত-প্রতিঘাতে কার্যকর হয়। উন্নয়ন পরিষদ যে পরিকল্পনা নেয় তা রাজ্য ও ভারতের কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সমর্থন করে। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পদ্ধতি ব্যাপক বিকেন্দ্রীকৃত আলোচনার ফল। পরিকল্পনা পদ্ধতি যত বেশি অভিজ্ঞ হয়েছে ততই লক্ষ্য ও উদ্দেশও ঠিক করার জন্য ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা নিয়েছে। স্বার্থান্বেষী-গোষ্ঠীর চাহিদা ও নির্বাচনী রাজনীতি এই পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। নিজস্ব এলাকাতে উন্নয়ন পদ্ধতি ও লক্ষ্যে বিধান সভার সদস্য ও সাংসদের ভূমিকা যথেষ্ট কার্যকর এবং এদেরকে নিয়েই স্থানীয় উন্নয়ন-প্রশাসনের পদ্ধতি ও লক্ষ্য ঠিক করা হয়। উন্নয়ন প্রশাসনে ক্রমশ বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। বিধানসভা ও সংসদের বিভিন্ন সময়ের নির্বাচন জনসাধারণকে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা যাচাই করতে সাহায্য করে ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পদ্ধতি মূল্যায়ন করে আধুনিকীকরণ কার্যকরী করতে অনুপ্রাণিত করে। ভারতে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঐক্যমতের মতাদর্শ শুধুমাত্র লিখিত আদর্শ নয়; ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এগুলি কার্যকর পদ্ধতি।

২৭.৩.৩ ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন ও সামাজিক সচলতা

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ভারতীয় সমাজের জীবন ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করেছে। শিল্পোন্নতি, নগরায়ন ও সামাজিক সচলতা ঘটেছে এর ফলে। অতীতের ভারতীয় সমাজে সামাজিক সচলতার সুযোগ ছিল সীমিত। নগরায়ণের পদ্ধতিও ছিল খুব ধীর। অধিকাংশ নগরেই ধরণ ছিল প্রাক্-শিল্প সমাজের মত। বর্ণ ও কারিগরী সংগঠনে বংশ পরম্পরায় ক্ষমতা বিভাজনের দ্বারাই শিল্প-ক্ষেত্রে কাজকর্ম চলত। অধিকাংশ নগরই ছিল হয় শাসকদের রাজধানী বা তীর্থক্ষেত্র। এই সমস্ত নগরের সামাজিক সংগঠন খুব জটিল হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মী-সংগঠনে, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধরণে পুরোন মূল্যবোধই কাজ করত। অতীতের ভারতীয় সমাজের সংগঠনে নগরগুলি বুদ্ধিজীবীদেরই সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিফলিত করত। অনেক সাংস্কৃতিক নতুনত্ব দেখা দিলেও এই সব নগরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চলাচল না থাকায় আমূল পার্থক্য ও পরিবর্তন খুব কমই দেখা দিত। আর্থ-সামাজিক কার্যাবলীতে এসব নগরে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনও খুব কমই ঘটত। ব্যবসা ও পরিবহন, শক্তি ও শ্রম-বিভাজনের পরিবর্তন খুব কম হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনও খুব অল্পই হ'ত।

ঐতিহ্যবাহী সমাজে সামাজিক সচলতা ব্যাক্তির মধ্যে না ছড়িয়ে পরিবারেই প্রসারিত হ'ত। বর্ণ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কোন দূরবর্তী নগর বা অঞ্চলে দেশান্তরী হয়ে 'উচ্চবর্ণের' বলে পরিচয় দেওয়া হ'ত। যোগাযোগ ও পরিবহনের সুযোগ খুব কম থাকায় এ ধরণের 'উচ্চবর্ণের' হওয়া খুব সহজ হ'ত। যুদ্ধ বা বিদ্যার্জনের মত বিশেষ

বিশেষ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের জন্য শাসকশ্রেণী অনেক সময় ঘোষণা জারি করে নিম্নবর্ণের কাউকে উচ্চবর্ণে প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক সচলতা ঘটাতে সাহায্য করত। তবে খুব অল্প ক্ষেত্রেই এধরণের সামাজিক সচলতা ঘটত। আমাদের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়ণের পর্যায়ের সাথে সাথে সামাজিক সচলতার মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়।

অনুশীলনী ২

১। ভারতে সামাজিক রূপান্তরের পদ্ধতিগুলি প্রতিফলিত হয়েছে (ঠিক উত্তরের পাশে দাগ দিন) ঃ

ক) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

খ) সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্টে।

গ) ভারতীয় ফৌজদারী মামলার আইনে।

২। গ্রামপঞ্চায়েতগুলির উদ্দেশ্য ঃ

ক) ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ।

খ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

গ) সমাজে দুর্বলতর শ্রেণীকে বিশেষ ক্ষমতা দান।

৩। পরিকল্পনা পদ্ধতি কি ভাবে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন এনেছে তার ব্যাখ্যা করুন। চার লাইনে উত্তর লিখুন।

.....

.....

.....

.....

২৭.৪ নাগরিকতা ও নগরায়ন

নাগরিক জীবনের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ধরণকে নাগরিকতা বলে। সামাজিক কাঠামো, জনসংখ্যা, এলাকার বিস্তৃতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিয়ে নগরের উন্নতিকেই নগরায়ন বলে। নগরের এলাকা ও সামাজিক কাঠামোই মোটামুটিভাবে নাগরিকতার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ছোট জায়গায় ঘন জনবসতি সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আচার আচরণের গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। এমনকি আবাসনের ধারাও এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। কোন নগরে কাজকর্মের প্রকৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা ও প্রশাসন প্রভৃতি নাগরিকদের সাংস্কৃতিক ধরণ, আবাসন পদ্ধতি ও চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। নগরে বসবাসের ফলে যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও জীবনধারা দেখা দেয় সমাজতাত্ত্বিকরা তাকেই নাগরিকতা বলে চিহ্নিত করেন। নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসারে সমাজ থেকে সমাজে নাগরিকতার প্রকৃতি পাল্টায়। নাগরিক উন্নতির ইতিহাসের ধারার পার্থক্যের সাথে এরও পরিবর্তন হয়।

২৭.৪.১ নাগরিকতার প্রভাব

সংক্ষিপ্তভাবে, নাগরিকতা এক সার্বজনীন, নামবিহীন, মনস্তাত্ত্বিক সচলতা যা নতুন ভাবধারার উদ্ভাবক; ব্যপকতরভাবে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অভিন্নতার সাথে এটি জড়িত। এর ফলে বহুমুখী জীবনধারা, সংস্কৃতিচর্চায় উচ্চতর বৌদ্ধিক মান, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যচর্চার প্রয়োগ এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। সমাজগতভাবে এই অবস্থা দাম্পত্য পরিবার প্রধান, দ্রুত কর্মপদ্ধতি ও সময় — নির্দিষ্ট আয়-ব্যয় বিশিষ্ট। সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে আত্মীয়তা, ধর্ম, ভাষা ও এলাকা ইত্যাদিতে জনগণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতিতে নাগরিকতা বিকশিত হয়। বিভিন্ন ধরণের এই সমস্ত সম্পর্কই নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। গ্রামের মত নগরে সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষ ধর্মীয় নৈকট্য ভাষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির জন্য যেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, নগরে একই এলাকার মানুষ তেমন কাছের হয়ে ওঠে না।

উচ্চস্তরে সামান্যীকরণের ক্ষেত্রে নাগরিকতার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয়। কোন নির্দিষ্ট নাগরিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারার ও কাঠামোর পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতে নগরের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে দেখা যায় বহু নতুন ধরনের কাজ, সামাজিক সচলতা, নতুন দক্ষতা, শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের আর্বিভাব সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের যৌথ-পরিবার প্রথা, অতীত ধর্মীয় আচার, বর্ণ ও বর্ণাশ্রম সংশ্লিষ্ঠ আচার আচরণ নগরে এখন প্রচলিত। নাগরিক জীবনে গোপনীয়তা ব্যক্তিগত স্বাধীকার, অসবর্ণ বিবাহ, বিভিন্ন অঞ্চলে লেনদেন থাকলেও অতীতের বহু বিশ্বাস ও আচার- আচরণ এখনও ভারতীয় নগরে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, অতীতের জীবনধারা ও বিশ্বাসের পরিবর্তনের জন্য সামাজিক আন্দোলন চলছে কিন্তু এর গতি এখনও খুব শ্লথ।

২৭.৪.২ ভারতে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য

ভারতে নগরায়ণের কতকগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে ভারতে নাগরায়ণের মাত্রা শিল্পায়নের মাত্রার সাথে খাপ খেয়ে হয়নি, কোথাও ভারসাম্যহীনভাবে 'অতি-নগরায়ণ' দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিকতা তথাকথিত ভারতের নগরের আকৃতিগত পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দেখিয়েছে — (ক) দেশীয় কেন্দ্র (পুরোনো নগর), (খ) সরকারী এলাকা (ঔপনিবেশিক নগর), (গ) ক্যান্টনমেন্ট (সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের বাসস্থান), (ঘ) বিশেষ, এলাকা (আমলা, রেলওয়ে কর্মচারী প্রভৃতি আবাসন এলাকা), (ঙ) দরিদ্র ও ভ্রাম্যমান মজুরদের ঝুপড়ি ও বস্তি এবং (চ) গ্রামীন এলাকা যা নগরের বিস্তৃতির সাথে সাথে এদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। নগরের এই বৃদ্ধি ও ধারা গ্রাম ও নগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক উচ্চস্তরের মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে। সমস্ত না হলেও ভারতের অধিকসংখ্যক নগরই আধুনিকীকরণের পথে অতীত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত।

২৭.৪.৩. নগরের জনসমাজ ও সামাজিক রূপান্তর

ভারতের নগরে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এখানে কাঠামোগত পার্থক্য ও সামাজিক সচলতা প্রভূত পারিমাণে দেখা যায়। শুধুমাত্র নগরের জনসংখ্যার বৃদ্ধি গ্রামাঞ্চল থেকে নগরাঞ্চলে জনগণের আগমন বোঝায়, যদিও নগরায়ণের স্পষ্ট মাপকাঠি হিসেবে একে গ্রহণ করা যায় না। ১৮৮১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত নগরে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি বেশ অল্পই ছিল (জনসংখ্যার ৯ থেকে ১০ শতাংশ)। ১৯৩১ সালের পরবর্তী সময়ে তা নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩১, ১৯৪১ ও ১৯৫১ সালে নগরের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১১.১, ১২.৮ ও ১৭.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ১৮.০, ১৯.৯ এবং ২৩.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। নগরায়নের এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র জনসংখ্যার বৃদ্ধি নয়, সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার, নারীদের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের হারের সামান্যীকরণ ও শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয় পরিবারেরও নগর অভিমুখে যাবার চেষ্টা। ভারতের নগরে আবাসন, বিপণন, জন হিতকারী প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতাদের সুরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাসেবী

প্রতিষ্ঠান বিশেষ কার্যকর। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতের নাগরিক জীবনে শিক্ষার সুযোগ এবং সংস্কৃতি ও বিনোদনের আকর্ষণ আধুনিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে।

জনগণনা ও জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সাহায্যে কর্ম-কাঠামো পরিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যায় কৃষিকাজে লাভজনকভাবে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত শহর ও নগরের বৃদ্ধির সাথে সাথে কমের দিকে তাই নয়, এই পরিবর্তন প্রশাসনিক ও আমলতান্ত্রিক প্রয়োজন সৃষ্টি করে। নগরের ব্যাপ্তির সাথে সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়। শ্রমজীবী শ্রেণী বা বেকারশ্রেণীর বাইরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এই সচলতা দেখা যায়। নগরে কর্মক্ষেত্রে সচলতার হার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশী কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের বাইরের কাজ খুব কম থাকায় পার্থক্যের হার খুব বেশী নয়। কৃষিকাজ থেকে কৃষিকাজের বাইরে পরিবর্তনের দিক থেকে বিভিন্ন স্তরে যাতায়াত যেমন স্পষ্ট তেমনি কৃষিকাজের বাইরের কাজে সচলতা তেমন স্পষ্ট নয়। ভারতে জনসাধারণের জীবনে শিক্ষা, প্রশাসন, শিল্প, বিভিন্ন ধরণের কাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নগরের প্রাধান্যই বেশী। এই প্রভাব শুধু সাংস্কৃতিক ও সমাজ জীবনেই প্রভাব বিস্তার করে না; সামাজিক ও কর্মস্তরে সচলতার পথ দেখায়। এ সমস্তই একের পর এক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ,সামাজিক ভূমিকা, প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো সৃষ্টি করে আধুনিকীকরণের সুবিধা করে দেয়। নগরায়ণ ও নাগরিকতা শুধুমাত্র ঐতিহ্যকে সরিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করে তাই নয়, এরা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার উপাদানের মিলনে পরিবর্তনের পথ বেঁধে দেয়। ভারতীয় সমাজে আধুনিকীকরণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে।

অনুশীলনী ৩

১। নগরায়ণ কাকে বলে? চার লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

২। নগরাঞ্চলেই সামাজিক সচলতা বেশি দেখা যায়। সঠিক উত্তরে (✓) দাগ দিন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৭.৫ সারাংশ

এই এককে মানব সমাজে সামাজিক রূপান্তরের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে আলোচনার সূত্রপাত হয়। সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনে নয়া প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথাই বেশি করে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের উদাহরণ ব্যবহার করে ভারতীয় সমাজে সমাজ-সংস্কৃতি রূপান্তরের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই এককে মানব সমাজে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের উপর ব্যাপক আলোকপাত করা হয়েছে।

২৭.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। (গ)

২। এর অর্থ বৌদ্ধিক চর্চ্চা, সাহিত্য আলোচনা, শিল্প, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, আইন প্রভৃতিতে প্রতিফলিত ঐতিহ্যকে বোঝায়।

৩। হ্যাঁ।

অনুশীলনী ২

১। (ক)

২। (খ)

৩। এর ফলে শিল্পোন্নয়ন, নগরায়ন ও সামাজিক সচলতা ঘটে থাকে। এর ফলে গ্রামীন ভারতে কৃষিকাজের উন্নতি হয়। এগুলি সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণে উৎসাহ দিয়ে থাকে।

অনুশীলনী ৩

১। নগরায়ণ বলতে সমাজ-কাঠামো, জনসংখ্যা এলাকার বিস্তৃতি ও সমাজ সংগঠনের দ্বারা নগরের উন্নতির পদ্ধতিকে বোঝায়।

২। হ্যাঁ।

একক ২৮ ❑ উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ

গঠন

২৮.০ উদ্দেশ্য

২৮.১ প্রস্তাবনা

২৮.২ উন্নয়ন কাকে বলে

২৮.৩ জনগণের অংশগ্রহণের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক

২৮.৪ মৌল নীতি হিসেবে জনগণের অংশগ্রহণ

২৮.৫ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ

২৮.৬ অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক

২৮.৬.১ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

২৮.৬.২ রূপায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

২৮.৬.৩ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী

২৮.৬.৪ অংশগ্রহণ কিভাবে হবে

২৮.৭ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি

২৮.৮ গ্রাম ও শহরাঞ্চলে অংশগ্রহণের প্রকৃতি

২৮.৯ অংশগ্রহণের বর্তমান পর্যায়

২৮.১০সারাংশ

২৮.১১গ্রন্থপঞ্জী

২৮.১২উত্তরমালা

২৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি ঃ

- উন্নয়নের অর্থ বুঝতে পারবেন।
- উন্নয়নের ধারার সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন, এবং
- অংশগ্রহণের মাত্রাকে প্রসারিত করার পথনির্দেশ করতে পারবেন।

২৮.১ প্রস্তাবনা

এই এককটির উদ্দেশ্য হ'ল উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা। বিকাশের সংজ্ঞা নির্ধারণ দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হবে। তারপর আমরা উন্নয়নের ধারার সঙ্গে জনসাধারণের অংশগ্রহণের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করব। অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পর আমরা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এটি কিভাবে বাড়ান যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করব।

২৮.২ উন্নয়ন কাকে বলে

উন্নয়নের ধারা মানুষের যাবতীয় কাজকর্মে পরিব্যপ্ত। একে সামাজিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে দেখা যায়। উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অর্থবহ পরিবর্তনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থনীতির পরিভাষায় বলা যায় উৎপাদনের ন্যূনতম উপাদান ব্যবহার করে সর্বাধিক উৎপাদনই এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ হ'ল একটি আবশ্যিক অঙ্গ।

উন্নয়নের ধারাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যিক। এই পরিকাঠামো গড়ে উঠলে তবেই নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্ভব হয়। এটি আরো প্রয়োজনীয় এই কারণে যে, এই পথেই প্রযুক্তির অগ্রগতি,, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলি প্রতিরোধ করে বাঞ্ছিত সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণের নিরন্তর প্রয়াসের দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে বলা যায়, জনগণের অংশগ্রহণকে জীবনের পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যাক্তি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। যে কোন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে জনগণের ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিক অংশগ্রহণের উপর। অংশগ্রহণ যত বেশী হবে, সাফল্যের সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে বাড়বে।

২৮.৩ জনগণের অংশগ্রহণের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক

বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরেই স্বীকৃত। তবে, অংশগ্রহণ বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তবে আজকের দিনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উত্তরোত্তর গুরুত্ব পাচ্ছে। এখন উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এমন লোক নেই বললেই চলে।

প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং সম্পদের যোগান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর শিল্পোন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা নিয়ে আগ্রহী হ'তে থাকে। প্রযুক্তির অপ্রতুলতাই উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ অথবা বর্জনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হ'ত। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করাকে অংশগ্রহণের এবং বর্জন করারে অংশগ্রহণ না করার সমার্থক্ মনে করা হ'ত। পরে অবশ্য প্রযুক্তির থেকে দৃষ্টি সরে আসে উৎপাদনের উপাদানের দিকে। উপাদানের সহজলভ্যতাকে উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং উৎপাদানের উপাদান উভয়ই বিত্তকেন্দ্রিক, তাই এক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের বিশেষ সুযোগ নেই।

১৯৬০ সালে প্রযুক্তি এবং সম্পদকে উন্নয়নের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য জনমত গড়ে তোলা এবং তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উপলব্ধি ক্রমেই দৃঢ় হ'তে থাকে যে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণকে যুক্ত না করতে পারলে সম্পদ অথবা প্রযুক্তির হস্তান্তর অর্থহীন। এই উপলব্ধির পরিপেক্ষিতেই উন্নয়নের আবশ্যিক অনুসঙ্গ হিসেবে জনগণকে যুক্ত করার তাগিদ দেখা দেয়।

২৮.৪ মৌলনীতি হিসেবে জনগণের অংশগ্রহণ

একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি, সম্পদ এবং সংগঠন একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (UNESCO) সুপারিশ করেছে যে সরকারগুলির কর্তব্য হ'ল জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও নারী সংগঠনের মত বেসরকারী সংস্থা প্রভৃতি আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। এদের সকলের সহযোগিতায় এবং পরামর্শে উন্নয়নের লক্ষ্য, নীতি এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এককথায় বলতে গেলে, সমাজকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের হিতার্থে অধিক সংখ্যক মানুষকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করাই হ'ল অংশগ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য।

অনুশীলনী ১

১। ন্যূনতম সম্পদের সাহায্যে অধিকতম উৎপাদন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উদ্দীপ্ত করে। সঠিক উত্তরে (✓) দাগ দিন

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান দুটি প্রতিবন্ধক কী ? এক লাইনে উত্তর দিন।

.....

২৮.৫ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ

অংশগ্রহণ সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে। প্রশ্নটি হ'ল, জনগণের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য কি ? সেই সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকটি প্রশ্ন ঃ উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এর তাৎপর্য কি ? কোন্ লক্ষ্যে উপনীত হ'তে এটি সহায়তা করে ? এইসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ সম্ভাব্য উত্তরগুলি উত্তরদাতার ব্যাক্তিগত মূল্যবিচারের (Value judgement) সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহলেও, আমরা কয়েকটি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের উল্লেখ করতে পারি। কিছু সমাজতত্ত্ববিদদের মতে অংশগ্রহণের দ্বারা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয়। এর দ্বারা স্থানীয় মানুষের অভিপ্রায় জানা যায়; উন্নয়নের উপযোগী ভাবনার জন্ম হয়; বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রস্তাবের ব্যবহারিক উপযোগিতা পরীক্ষা করে সেগুলির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা যায়; সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজ নিজ পরিবেশ ও প্রয়োজনের পরিপেক্ষিতে আরও কর্মকুশলী করে তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী করা যায়; স্থানীয় সম্পদের সংগ্রহ এবং তার উপযুক্ত বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা যায়; সর্বোপরি পারস্পরিক সহযোগিতার একটি বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। জনগণের অংশগ্রহণ উপরোক্ত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে এবং তার ফলে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তোলে।

২৮.৬ অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক

অংশগ্রহণের কথা উঠলে এর তিনটে দিকের আলোচনা অবশ্যই করতে হয়; অংশগ্রহণ বিষয়টি কি, অংশগ্রহণ কে করবে এবং অংশগ্রহণ কিভাবে করবে। অংশগ্রহণ কি, এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত চার ধরণের অংশীদারীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

ক) সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ।

খ) রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ।

গ) অংশগ্রহণের ফলভোগ।

ঘ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ।

সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে যদি বলে উপাদান (input), তাহলে অংশগ্রহণের ফলভোগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে বলা যাবে তার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ একটা ভাগ হ'ল অবদানমূলক এবং অন্যটি বন্টনমূলক। সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের রূপায়ণ যদি হয় অংশগ্রহণের অবদান তাহলে বাকি দু'টিকে বলা চলে উন্নয়নের সুফলের সামাজিক বন্টন।

২৮.৬.১ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

ধ্যানধারণা গড়ে তোলায়, পরিকল্পনা রচনায়, বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে থেকে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে আমরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। সিদ্ধান্তগ্রহণ তিন ধরণের হতে পারে। এগুলি হ'ল প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, প্রবহমান সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনাগত সিদ্ধান্ত। স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রয়োজনকে চিহ্নিত করেই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কার্যপদ্ধতি, অর্থের যোগানের ব্যবস্থা, সঞ্চয়, মূল্যায়নের মান নির্ণয় প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। প্রবহমান (ongoing) সিদ্ধান্ত বলতে বোঝায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্পকে চালু রাখা অথবা বন্ধ করে দেওয়া, গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্যায়নের দ্বারা এর উপযোগিতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। পরিচালনাগত (operational) সিদ্ধান্তের অর্থ হ'ল উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থা, সমবায় এবং অন্যান্য ,স্থানীয় সংগঠনের ভাগিদারীর মূল্যায়ন।

২৮.৬.২ রূপায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

সম্পদ সংগ্রহ, পরিচালন এবং সমন্বয় সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণ প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রকল্পগুলি রূপায়িত হ'লে জনসাধারণই উপকৃত হয়, কারণ শেষ পর্যন্ত জনগণই উন্নয়নের সুফল ভোগ করে। এইসব সুফল ব্যক্তিগত, অথবা সমষ্টিগত হ'তে পারে, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক হ'তে পারে। উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়িত করার পর এগুলির নিয়মিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন, প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি না। অনুসন্ধান করা প্রয়োজন প্রকল্পের ফলে জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয়েছে কি না। জনগণের অংশগ্রহণই কর্মসূচী এবং প্রকল্পের মূল্যায়নকে অর্থবহ করে। তাই প্রকল্পের প্রাথমিক রূপরেখাতে এই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই অংশগ্রহণের কোন ধরাবাঁধা কাঠামো নেই। এটি প্রত্যক্ষ হ'তে পারে, আবার পরোক্ষও হ'তে পারে। মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ যেমন একটি পথ, তেমনই অন্যান্য পথ হ'ল পরোক্ষ পরামর্শ, সংবাদপত্রে চিঠিপত্র বা প্রয়োজনে সংগঠিত প্রতিবাদ। আসল কথা হ'ল মনে রাখতে হবে মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বেশ কঠিন কাজ।

২৮.৬.৩ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী

অংশগ্রহণকারী কারা ? এই প্রশ্নের চারটি উত্তর আছে। প্রথমত, স্থানীয় বাসিন্দারা, দ্বীতীয়ত, স্থানীয় নেতারা, তৃতীয়ত, কর্মকর্তারা এবং চতুর্থত, বিদেশী বিশেষজ্ঞরা। উপরোক্ত প্রতিটি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের চরিত্র নির্ধারিত হয় সামগ্রিক প্রয়োজন, কারিগরী দক্ষতা এবং সরকারী নীতির দ্বারা। তাছাড়া প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীর সদস্যদের বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, জীবিকা ইত্যাদির দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, এগুলির মাধ্যমে অংশগ্রহণের প্রসার এবং চরিত্র উপলব্ধি করা যায়। অন্য কয়েকটি দিকও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, যেমন অংশগ্রহণের ভিত্তি কি ? অংশগ্রহণ কি ঐচ্ছিক, না ব্যধ্যতামূলক ? অর্থাৎ যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা কি কোন প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে করছেন, না স্বেচ্ছায় করছেন ?

অনুরূপভাবে অংশগ্রহণের ধরণ নিয়েও অনুসন্ধান করতে হবে। এটি কি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ ? অংশগ্রহণের তাগিদ কি ব্যক্তিগত না প্রাতিষ্ঠানিক ? আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় হ'ল অংশগ্রহণের পরিধি। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পে কতটা সময় ব্যয় করেছে, কতটা আগ্রহ দেখিয়েছে এগুলি সম্পর্কে, খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। পরিশেষে একথা ভুললে চলবে না অংশগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'ল জনসাধারণকে ক্ষমতা অর্জন করতে দেওয়া। তাই অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হবার জন্য জনগণের কতটা ক্ষমতা আছে সেটাও দেখতে হবে।

২৮.৬.৪ অংশগ্রহণ কিভাবে হবে

ইতিপূর্বে আমরা অংশগ্রহণকারী কারা, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। এবার অংশগ্রহণ কি ভাবে ঘটবে সেটা বোঝার চেষ্টা করব। অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে প্রথমেই কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য এবং কাজের পরিবেশ, দু'টিকেই পরীক্ষা করতে হবে। প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে জটিল কৃৎকৌশল, সম্পদের প্রয়োজনীয়তা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, তাৎক্ষণিক উপযোগিতা, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের নমনীয়তা, প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি। এগুলি সাধারণভাবে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিষয়গুলি ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, অন্যথায় প্রকল্পের রূপারেখায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের মধ্যে আছে প্রাকৃতিক এবং জৈবিক বিষয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপাদান, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়। অংশগ্রহণের ধরণকে এইসব বিষয়গুলি গভীর এবং সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে।

আমরা স্থানীয় শাসনে, সমবায় সংগঠনে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণকে বিচার করব। উন্নয়ন পদ্ধতিতে এই প্রতিটি বিভাগের ভূমিকা নীচে আলোচিত হ'ল।

(ক) স্থানীয় শাসন

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিবর্তনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আবির্ভাব এক অনন্য ঘটনা। এটির ভিত্তি হ'ল স্বশাসন। অর্থাৎ সামগ্রিক স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে নাগরিকদের অংশগ্রহণ। এই ব্যবস্থায় কি কাজ করা হবে, কার মাধ্যমে কার হবে এবং কিভাবে করা হবে — এই সব সিদ্ধান্ত জনসাধারণ নিজেরাই গ্রহণ করে। যেহেতু স্থানীয় শাসনের অধিক্ষেত্র, জনসংখ্যা এবং কাজকর্ম সীমিত, সেহেতু আঞ্চলিক জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ সুনিশ্চিত করা তুলনায় অনেক সহজ। কিন্তু আধুনিক সরকারের শাসনপদ্ধতি অনেক জটিল। এক্ষেত্রে তাই সারাক্ষণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেই কারনেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিনিধত্বমূলক ব্যবস্থায় নাগরিকরা তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। নাগরিকদের পক্ষে এই প্রতিনিধিরাই সরকারী কাজকর্মে

অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের অতীতের কাজকর্ম বিবেচনা করে নাগরিকরা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এঁদের নির্বাচিত করেন।

স্থানীয় শাসনের দুটি শাখা। একটি শাখা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই শাখার দায়িত্ব হ'ল আলোচনার মধ্যে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়নের তদারকি করা। প্রকল্পের কি, কেন, কিভাবে, কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের দায়িত্ব প্রথম শাখার। প্রথম শাখা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় শাখা সেগুলিকে যথাযথ রূপদান করে, প্রকল্পগুলিকে কার্যে পরিণত করে।

ভারতবর্ষে স্থানীয় শাসন প্রাদেশিক সরকারগুলির দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। এই স্থানীয় শাসন সাংবিধানিক মর্যাদা অর্জন করেছে অতি সম্প্রতি। এর কাজকর্ম, ক্ষমতা, সম্পদ, অধিক্ষেত্র ইত্যাদি নানাভাবেই প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদিও প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের নিজেদের প্রয়োজনমাফিক স্থানীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তবু আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এইসব স্থানীয় শাসনে সাধারণ চিত্রটি এতকাল এইরকম ছিল — এগুলির আর্থিক বুনিয়াদ দুর্বল, রাজনৈতিক ব্যবস্থা আগোছালো, আন্তঃবিভাগীয় কোন্দলে জীর্ণ। তাছাড়া, রাজ্যসরকারগুলি যখন তখন এদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে এসেছে। এইসব নানা কারণে স্থানীয় শাসনের প্রতি জনসাধারণ ক্রমেই আস্থা হারাচ্ছিল। স্থানীয় শাসনের এইসব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার তাগিদেই সংবিধানে ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধন আনতে হয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত রাজ উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করবে, এটাই তো প্রত্যাশিত।

এটাও মনে করা হয়েছিল যে, মাঝে মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও জনসাধারণ সমস্ত রকমের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এটা আশা করা হয়েছে যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে উঠবে এবং সেই সূত্রে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নয়ণের প্রকল্প রচনা ও রূপায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। নির্বাচনে ভোট দেওয়া পঞ্চায়েত রাজে অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ রূপ। কিন্তু অংশগ্রহণের অন্যান্য অভিব্যাক্তিগুলি মূলতঃ পরোক্ষ। জনগণের অংশগ্রহণ পরিমাণগতভাবে যতই সামান্য হোক, এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে দুঃখের কথা, ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটা প্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মৃতপ্রায়।

পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং পৌর--কাউন্সিল — এগুলি সবই জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান। স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রয়োগের ফলে এগুলির সৃষ্টি। কিন্তু দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তগুলি ক্ষেত্রবিশেষে দলীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এর ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিই ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে পড়ে। প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে। তাছাড়া জাত-পাত এবং গোষ্ঠীস্বার্থ সমাজের ক্ষমতাবান অংশের পক্ষেই কাজ করে। এই কারণে সমাজের মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী অংশ উন্নয়নের ফল ভোগ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। অর্থাৎ একদিকে মেকি-বিকেন্দ্রীকরণের অছিলায় প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে সেগুলিকে অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে। অন্যদিকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থানীয় সামাজিক সম্যাগুলিকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলির মধ্যে ক্রমেই আত্মতৃপ্তির ঝোঁক দেখা দেয়। এগুলিকে আলস্য গ্রাস করে নেয়। ফলে এগুলি অনেক সময়েই সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। এদের কার্যধারাও সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে যায়। এমনকি জনপ্রতিনিধিরাও স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদাকে যথাযথভাবে তুলে ধরেন না। দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ এবং রাজনৈতিক তাগিদে এগুলিকে ব্যবহার করার ফলে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নষ্ট

হয় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়নের লক্ষ্যে সজীব করতে হলে জনগণের অংশগ্রহণকে প্রকৃতই সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) সমবায় সংগঠন

সমবায় হ'ল মূলত জনগণের সংগঠন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণেকে জোরদার করতেই এগুলিকে গড়ে তোলা হয়। 'সমবায় সমিতি আইন' অনুযায়ী গঠিত কয়েকটি সংস্থা হ'ল সমবায় ঋণদান সমিতি, আখচাষ সমবায়, আবাসন সমবায় ইত্যাদি।

অধিকাংশ সমবায় সংগঠনের একটা বড় দুর্বলতা হ'ল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে অংশগ্রহণে সমবায়-সদস্যদের অনীহা। ফলে প্রভাবশালী এবং স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় কিছু লোকই সমবায়গুলি চালায়। তাছাড়া সমবায় সংস্থাগুলিতে নিয়মিত নির্বাচনও হয় না। এর ফলে সমবায় আন্দোলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক লোকেরা ক্রমেই তাঁদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

(গ) সমিতি

সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের আর একটি অভিব্যক্তি হল সমিতি। এগুলি গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। করদাতা সমিতি, উপভোক্তা সমিতি, আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতি প্রভৃতি এই ধরনের সমিতির কয়েকটি উদাহরণ। যাদের নিয়ে সমিতিগুলি গঠিত হয় তাদের উন্নতিবিধান করাই এই সব সমিতিরগুলির উদ্দেশ্য। সমিতিগুলির কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে অঞ্চলের সাধারণ সমস্যাগুলি এবং সেই সব সমস্য সমাধানের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ঘ) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, শিশুর পরিচর্যা, নারীকল্যান, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সব সংগঠনগুলির ছত্রছায়ায় সমমনোভাবাপন্ন লোকেরা একত্রিত হয়ে কল্যাণকর্মে ব্রতী হন। তাঁরা সাধারণ মানুষকে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে উন্নয়নের সামগ্রিক বোঝা অনেকটাই লাঘব করে দেন। সমিতি স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'ল জনসাধারণের প্রাণবন্ত সহযোগ সুনিশ্চিত করা, কারণ এই সহযোগিতা ছাড়া উন্নয়নের কোন কর্মসূচীই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ সফল হলেও তার দ্বারা উন্নয়নের সব সমস্যার সমাধান করা যায় না।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উন্নয়নের উদ্যোগে কাঙ্খিত মানবিক স্পর্শ দেয়। যেহেতু এখানে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব অপ্রত্যক্ষ, সেহেতু সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার বাতাবরণ গড়ে ওঠে। এই সহযোগিতা অংশগ্রহণের রূপ নিয়ে উন্নয়নের উদ্যোগকে অর্থবহ করে তোলে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নিম্নোক্ত শর্তগুলি পূরণ করলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি আরও অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

প্রথমতঃ এগুলিকে হতে হবে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত জনগণের প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল-স্তরের সংগঠনগুলিকে আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। এগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে লাগাতার প্রয়াস করতে হবে। তৃতীয়ত, নিজেরা কোন প্রকল্প পরিচালনা

না করে এদের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে প্রকল্প পরিচালনায় সাহায্য করা। চতুর্থত, বেসরকারী সংস্থাগুলির কর্তব্য হ'ল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বনিযুক্তির সম্ভাবনাকে প্রসারিত করা। এর অর্থ হ'ল এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে মানুষ অপরের গলগ্রহ হয়ে না থেকে আত্মানির্ভরশীল হবার প্রেরণা পায়। পঞ্চমত, বেসরকারী সংস্থাগুলির দায়িত্ব হ'ল জাতীয় উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে জনসাধারণের মধ্যে অনুরূপ চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটান। কারণ, তাহলেই সাধারণ মানুষ তাদের জন্য রচিত এইসব যোজনা ও পরিকল্পনা ফল ভোগ করতে পারবে। ষষ্ঠত, সরকারেরও উচিত বেসরকারী সংস্থাগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা তাদের কর্তব্য। কারণ, তাহলেই একই প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি রোধ করে সম্পদের অপব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে। সকলের মধ্যে উপযুক্ত যোগাযোগ থাকলে তবেই সমাজের অধিকতর উপকার করা সম্ভব।

অনুশীলনী ২

১। অবদানমূলক (Contributive) এবং বিতরণমূলক (distributive) দিক থেকে অংশগ্রহণের চারটি ধরণ বর্ণনা করুন। উত্তর চার লাইনে সীমাবদ্ধ রাখুন।

.....

.....

.....

.....

২। অংশগ্রহণকারী চারটি গোষ্ঠী কি কি ? এক লাইনে উত্তর করুন।

.....

৩। আপনার রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দুটি উদাহরণ দিন। আপনি কিভাবে এর যে কোন একটিতে অংশগ্রহণ করেন এক লাইনে লিখুন।

.....

৪। আপনার অঞ্চলের চারটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম লিখুন।

.....

.....

.....

.....

২৮.৭ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি

উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ পথে অনেক বাধা আছে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, ব্যাপক অশিক্ষা, সামাজিক ও সাম্প্রায়িক সমস্যা, দায়বদ্ধ আমলাতন্ত্র এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, তথ্যের অপ্রতুলতা এবং কারিগরী ও সাংগঠনিক সমস্যা এই বাধার কিছু উদাহরণ। এগুলিই অংশগ্রহণের পথে প্রধান সমস্যা।

অশিক্ষা, অস্বাস্থ, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং মুষ্টিমেয় কিছু লোকের আধিপত্য — এগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অশিক্ষার কারণেই মানুষ শিক্ষিত লোকের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য মানুষ অবস্থাপন্ন লোকের দ্বারস্থ হয়। এই নির্ভরশীলতাই নাগরিককে ক্রমেই দুর্বল করে তোলে। এর ফলে অংশগ্রহণের ইচ্ছাটাই চলে যায়।

এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় ক্ষমতাবান স্থানীয় ব্যাক্তিদের চাপ এবং আমলাতন্ত্রের বাধা। অংশগ্রহণ করতে হ'লে সময় এবং সম্পদ — দু'টিই বিনিয়োগ করতে হয়। গরীবরা তাঁদের অন্নের সংস্থান করতেই এ দুটিকে বিনিয়োগ করে থাকেন। ফলে অংশগ্রহণের ইচ্ছাটাই চলে যায়।

এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় ক্ষমতাবান স্থানীয় ব্যাক্তিদের চাপ এবং আমলাতন্ত্রের বাধা। অংশগ্রহণ করতে হ'লে সময় এবং সম্পদ — দু'টিই বিনিয়োগ করতে হয়। গরীবরা তাঁদের অন্নের সংস্থান করতেই এ দু'টিকে বিনিয়োগ করে থাকেন। ফলে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য দু'টির কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না। সেইজন্য তাঁরা অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকলেও কার্যক্ষেত্রে কিছুটা উদাসীন থাকেন। অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবও তাঁদের অনীহার অন্যতম কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক কার্যাবলী জনসাধারণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত — একথা বিজ্ঞাপিত হলেও গরীবরা এসবের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেন না। এর ফলে উন্নয়নের প্রক্রিয়া থেকে গরীবরা বাদ পড়ে যান।

২৮.৮. গ্রাম শহরাঞ্চলে অংশগ্রহণের প্রকৃতি

উপযুক্ত গণসংগঠনের মাধ্যমেই অংশগ্রহণের মনোভাবকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করা যায়। একক প্রয়াসের চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ অনেক বেশি ফলপ্রসূ। কিন্তু আমরা জানি ভারতবর্ষে গরীবরা সঙ্ঘবদ্ধ নন। ফলে তাঁরা উন্নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুপ্রবেশ করতে পারেন না, কারণ এগুলিতে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীতে গ্রামাঞ্চলে গণউন্নয়ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কিছুটা সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু দু'একটি রাজ্য বাদ দিলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী রাজ তার জন্মলগ্ন থেকেই এত সমস্যায় জর্জরিত যে জনগণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে এটি আদপেই জোরদার করতে পারেনি। অন্যদিকে সমবায়ের মত স্থানীয় সংস্থাগুলি ইতিপূর্বে উল্লেখিত কারণে কায়েমী স্বার্থের শিকার হয়ে পড়ে। এইভাবে দারিদ্র এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য পঞ্চায়েত এবং সমবায় — উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক এই দু'টি প্রতিষ্ঠানেই দরিদ্র জনসাধারণের অংশগ্রহণ সমস্যাঙ্কুল হয়ে পড়েছে।

শহরাঞ্চলে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে পৌর-নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি অবশ্য জনগণকে যুক্ত করার তাগিদ নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যই শহরাঞ্চলের মৌলিক পরিষেবা (Urban Basic Services) অথবা শহরাঞ্চলে নাগরিক উন্নয়ন কর্মসূচী (Urban Community Development Programme)

গৃহীত হয়েছে। এইসব কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হ'ল প্রধানত শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের গরীবদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা গড়ে তোলা যাতে তাঁরা ক্রমেই আত্মোন্নয়নে প্রয়াসী হন। এছাড়া শহরাঞ্চলের গরীবদের উন্নতিকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যপকতর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন সংস্থা গড়ে তোলা আবশ্যিক যার ভিত্তি হবে আত্মাবিশ্লেষণ ও আত্মোন্নতি।

২৮.৯ অংশগ্রহণের বর্তমান পর্যায়

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, পরিকল্পনা, রূপায়ন, ফলভোগ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজকর্মেই অংশগ্রহণ ঘটে থাকে। বাস্তবে কিন্তু পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ নীচের স্তর পর্যন্ত সব রাজ্যে প্রসারিত হ'তে পারেনি। প্রথাগত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত উচ্চতর স্তরেই গৃহীত হয়। জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের নেতারাই এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক স্তরের পরিকল্পনার চাবিকাঠিও থাকে বিশেষজ্ঞদের হাতেই। উন্নয়নের প্রকল্পগুলি রচনা ও রূপায়ন করে শাসনতান্ত্রিক সংস্থাগুলিই। রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে — যেমন, বস্তি উন্নয়ন, শিশু-পরিচর্যা, পরিবার-পরিকল্পনা, আবাসন— সীমিত পরিমাণে অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

বাস্তু জমি বন্টন, ঋণদান, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, দুর্বলতর শ্রেণীকে সাহায্যদান ইত্যাদি বেশ কিছু ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণেব পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল দালালদের উপস্থিতি এবং ক্ষমতাবান লোকেদের প্রভুত্ব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনজীবনের দুর্নীতি।

বর্তমানে মূল্যায়নের কাজটা করে থাকেন বিভিন্ন 'এলিট' গোষ্ঠী এবং সংবাদপত্র সংগঠনগুলি। এরাই উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যসূচীর মূল্যায়ন করে। নাগরিকদের অবশ্য অভাব অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকে, তবে এইসব অভিযোগের প্রতি জনপ্রশাসনের দৃষ্টি পড়ে সামান্যই। সাধারণ নাগরিকের কাছে অংশগ্রহণের একমাত্র সুযোগ হ'ল নির্বাচন। তবে নির্বাচনে যেহেতু বড়রকমের বিষয়বস্তু, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং টাকার আধিপত্য, উন্নয়নের সমস্যা সেখানে কোনই গুরুত্ব পায় না।

অংশগ্রহণ বাড়াবার উপায়সমূহ

আমরা দেখেছি জনগণকে উন্নয়নের কার্যসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার পথে অনেক প্রতিবন্ধক। এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন জনসমষ্টির সমর্থন সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা। তবেই উন্নয়ন প্রকল্প যাদের কল্যাণসাধনের জন্য উদ্দিষ্ট তাঁদের সক্রিয় সমর্থন পাওয়া সম্ভব। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের আগ্রহ যত কম, তাদের যুক্ত করার প্রয়োজনও তত বেশী। নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন পাবার ক্ষেত্রে উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথমত, অংশগ্রহণকে কার্যকর করতে হ'লে কর্মসূচীর উদ্দেশ্যকে ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শুধু তাই নয় এমন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যা গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। সকলের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে তবেই সাধারণ মানুষ গৃহীত কর্মসূচীকে তাদের কর্মসূচী বলে মনে করতে পারবে এবং কর্মসূচীর সার্থক রূপায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারবে। ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকল্পকে সীমিত করলে শিক্ষা, আলোচনা, ব্যাখ্যা এবং সমঝোতার মধ্যে দিয়ে সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। বড় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটা দুরূহ; কারণ সেখানে পরস্পরপর পরস্পরের অপরিচিত। এক্ষেত্রে অনুভূত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী গড়ে তোলার দায়িত্ব যদিও বহিরাগত সংগঠকের তবু এ কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যাক্তিরা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্মে

নেতৃত্ব দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কর্মসূচীতে যদি উৎপাদনমুখী এবং আয়সৃষ্টিকারী হয় তবেই মানুষ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে উৎসাহ পাবেন। যদি ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে তবে কোন কৃষক বা শ্রমজীবী কার্যসূচীর সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাইবেন না। অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতা-অর্জন — এ দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই উৎপাদনের উপকরণের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কৃষক বা শ্রমিক অংশগ্রহণে অনীহা বোধ করবেন। উৎপাদনের উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই ক্ষমতার নাগাল পাওয় যায়। ক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনা অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

তৃতীয়ত, তথ্যসংগ্রহের সুযোগ থাকলে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি গ্রামের গরীব মানুষ তাঁদের হিতার্থে গৃহীত কর্মসূচীগুলি সম্পর্কে প্রায়শঃই খবর পান না। আসল কথা হ'ল, সার্থক অংশগ্রহণের উপযোগী তথ্যের একান্তই অভাব। যদি তথ্যের অভাব ঠিকমত পূরণ করা যায় তাহলে জনসাধারণ পরিকল্পনাগুলিকে বুঝতে পারবেন এবং এগুলির রূপায়নে অংশগ্রহণ করে তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রূপায়ন, উভয় ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সঠিক তথ্য সংবাদ সংগ্রহ করে সাধারণ মানুষকে তা সরবরাহ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

চতুর্থত, উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণকে যুক্ত করার উদ্দেশও আরও কিছু সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভিনব যোগাযোগের মাধ্যম, গোষ্ঠী-ব্যবস্থা, সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা, দায়িত্ব সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং উপযুক্ত সমর্থক-ব্যবস্থা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চমত, একথা সুবিদিত যে, দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল অজ্ঞতা। এর থেকেই সৃষ্টি হয় অনীহা এবং ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার প্রবনতা। আর এ সবই হ'ল উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। সেইজন্যই অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়াবার উদ্দেশ্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাঞ্ছিত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইভাবে নির্ভরশীলতার অবাঞ্ছিত প্রভাবকে দূর করা সম্ভব হবে।

সবশেষে বলা যায় উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনসাধারণকে যুক্ত করার আরও কয়েকটি উপায় আছে। নীতিগত ও আইনগত সমর্থন, অংগ্রহণের মূল্যায়ণ, বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ ইত্যাদি অংশগ্রহণকে দ্রুততর করতে সহায়তা করে। সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যৌথভাবে অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে হবে। সেইসঙ্গে ইতিমধ্যে যে সব পদ্ধতি রয়েছে সেগুলিকেও আরও কার্যকর করতে হবে। তবেই অংশগ্রহণ অধিকতর অর্থবহ হয়ে উঠবে।

অনুশীলনী ৩

১। অংশগ্রহণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক কি কি ? চারলাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....